কাজের যন্ত্র কমপিউটার

প্রদীপচন্দ্র বসু

যোগমায়া প্রকাশনী
৬০, পটুয়াটোলা লেন।
কলকাতা ৭০০০ ০৯

প্রথম প্রকাশ ॥ ১ বৈশাখ '৬৪, ইংরেজি ১৫ এপ্রিল '৫৭

প্রকাশক ॥ যোগমায়া প্রকাশনী, প্রযত্নে শ্যামলী ঘোষ, এল, আই, জি বিল্ডিং, ব্লক. সি ॥ ফ্ল্যাট : ৩ ॥ ৪১ নারকেলডাঙ্গা নর্থ রোড ॥ কলকাতা, ৭০০০০৯

যোগমায়া প্রকাশনীর সিটি অফিস : ৬০ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০১১

প্রচ্ছদ : সুবোধ দাশগুপ্ত ॥ বাইণ্ডার : ক্যালকাটা বুক বাইণ্ডার্স

মুদ্রাকর : সত্যরঞ্জন জানা / মাদার প্রিণ্টার্স

৩৮এইচ/১৮/১, মানিকতলা মেন রোড, কলিকাতা-৭০০০৫৪

দূর্বা, আমার স্ত্রীকে

লেখকের কথা

কমপিউটার নিয়ে বাংলায় একটা বই লেখার ইচ্ছা জেগেছিল অনেকদিন আগে। সেই থেকে তথ্য সংগ্রহ শুরু। এতদিনে ইচ্ছা বাস্তবে রূপায়িত হল যোগমায়া প্রকাশনীর সহযোগিতায়, বিশেষ করে শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষের উৎসাহে।

জীবনের সর্বস্তরে, শিল্পে, কৃষিতে, চিকিৎসায়, খেলাধূলায়—উন্নত দেশগুলিতে কমপিউটার এখন সব কাজেই মানুষের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে। এমন কি এই যন্ত্র এখন শিশু ও কিশোরদের শিক্ষক, খেলার উপকরণ ও সময় কাটানোর সঙ্গী। দেরীতে হলেও, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কমপিউটার ধীরে ধীরে আসছে আমাদের দেশে। ঢুকে পড়ছে আমাদের জীবনের অন্দরমহলে। এখন সময় এসেছে এই যন্ত্রটি সম্পর্কে আমাদের ভয় দূর করার। দরকার এই যন্ত্রটিকে ভালভাবে চেনার, জানার। সেই উদ্দেশ্যেই এই বই লেখার প্রয়াস।

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, বইটি লিখতে আমাকে অসংখ্য বিদেশী বই ও দেশী-বিদেশী পত্র পত্রিকার সাহায্য নিতে হয়েছে। লিখতে গিয়ে, বহু ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ খুঁজে বের করতে পারিনি। কিছু ক্ষেত্রে যে সব বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করেছি তা বোধহয় অনেকের কাছে যথার্থ বলে না মনে হতে পারে! আদতে কমপিউটার বিজ্ঞান আমাদের দেশে নতুন। এই বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার যখন বাড়বে, বাংলা প্রতিশব্দও তৈরি হবে। আশা করি সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা আপাতত নিজগুণে এই বইয়ের উপরোক্ত দুর্বলতাটুকু ক্ষমার চোখে দেখবেন। এছাড়া অন্য কোন ভুলত্রুটি থাকলে তার জন্যেও ক্ষমা চাইছি।

কমপিউটার নিয়ে লিখতে শুরু করলে শেষ করা দুরূহ। মানুষের আবিষ্কৃত এই যন্ত্র আজ মানুষকেই টেক্কা দিতে চলেছে। কমপিউটার সম্পর্কে ছোট বড় সকলেই যাতে একটা সামগ্রিক ধারণা করতে পারেন, সেই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই বইয়ের তথ্যসূচী তৈরি করা হয়েছে। বইটি পড়ে সকলের ভাল লাগলে তবেই আমার উদ্দেশ্য ও পরিশ্রম সার্থক।

১ বৈশাখ, ১৩৬৪

গণনার ইতিহাস

মানুষ প্রথম কবে গুণতে শিখেছিল? এ তথ্য বোধহয় কারুরই জানা নেই! ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন, মানব সভ্যতার গোড়ার দিকে আদিম মানুষের গণনার কোন প্রয়োজনও ছিল না। তখন বিনিময় প্রথা বা ব্যবসা-বাণিজ্য চালু হয়নি বলে গণনার দরকারও ছিল না। প্রকৃতির অঢেল সম্পদ মানুষ যথেচ্ছভাবে হিসেব-নিকেশ না করে ব্যবহার করেছে। কোন জিনিষকে কেউ ব্যক্তিগত সম্পদ বলে ভাবতো না।

খুব সম্ভবত মানুষের একাকীত্ববোধ থেকে 'এক' সংখ্যাটির জন্ম! মানব সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তাধারারও ক্রমবিকাশ ঘটে। এই বিকাশের ফলে একদিন আদিম মানুষ ভেবে দেখেছিল, তাদের সমাজে প্রতিটি মানুষের চেহারায় মিল থাকলেও, একক হিসাবে প্রতিটি মানুষই একা। বহু সংখ্যায় এই একা মানুষ একত্রিত হলে হয় অনেক। গণনার জন্য প্রথম মানুষ,

'এক' এবং 'অনেক', এই দুটি সংখ্যাই ব্যবহার শুরু করে। আবার 'অনেক' বলতে কত তাও স্থির ছিল না তখন। এর কিছু সময় পর 'দুই' সংখ্যার উৎপত্তি হয়। কিভাবে, কেউ বলতে পারে না আজ! তবে ঐতিহাসিকদের ধারণা, আদিম মানব সমাজ সেই থেকে কয়েক হাজার বছর ধরে এই 'এক', 'দুই' ও 'অনেক'—তিনটি সংখ্যা দিয়েই তাদের গণনার সব প্রয়োজন মিটিয়েছে।

দু হাতের দশটি আঙ্গুল থেকে যে অধিকাংশ মানব সমাজে দশমিক গণনা পদ্ধতির (বেস-টেন সিস্টেমস) জন্ম, গ্রীক দার্শনিক এ্যারিষ্টোটল তা প্রথম আবিষ্কার করেন। দশের বেশি গুণতে হলে সে সময় আর একজন মানুষের হাতের আঙ্গুলের সাহায্য নিতে হত। আফ্রিকার অনেক আদিম মানুষ এখনো এভাবে গোণে।

আঙ্গুল দিয়ে গুণতে গুণতে মানুষ যখন দেখল ঠিক সুবিধে হচ্ছে না, শুরু হল পাথরের টুকরো বা নুড়ির ব্যবহার। হাতের আঙ্গুল যাকে ইংরেজীতে বলে 'ডিজিট', তার থেকেই 'ডিজিটাল' শব্দটির উৎপত্তি। আর পাথরের নুড়ি, যাকে রোমানরা বলত 'ক্যালকুলি', 'ক্যালকুলেটার' শব্দটি তৈরি হয়েছে তার থেকে।

পাথরের নুড়ির পর গোণার কাজে মানুষ হাড়ের টুকরো ও গাছের সরু ডাল ব্যবহার শুরু করে। নৃতত্ত্ববিদরা চেকোশ্লোভাকিয়ায় গোণার কাজে ব্যবহৃত এরকম একটি হাড়ের টুকরো উদ্ধার করেছেন। টুকরোটি এক অল্পবয়স্ক নেকড়ের চোয়ালের হাড়। এতে দুভাগে কাটা আছে পঞ্চান্নটি দাগ। একভাগে পঁচিশ, অন্যভাগে তিরিশ। পড়ার সুবিধের জন্য প্রত্যেকভাগে আবার পাঁচটি করে দাগ দলবদ্ধ করা।

প্রথমদিকে মানুষের জানা ছিল না সংখ্যাকে প্রকাশ করার ভাষা। কাউকে কোন সংখ্যা জানাতে হলে মানুষ সাহায্য নিত হাতের আঙ্গুল বা পাথরের টুকরো বা নুড়ির। ইঙ্গিতে বোঝাবারও চেষ্টা করতো। সংখ্যাকে মানুষ যখন ভাষায় প্রকাশ করতে শিখলো, ততদিনে সে যোগ বিয়োগ করতেও শিখে গেছে। ধর্মীয় ও সামরিক প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ সংখ্যাকে ভাষায় প্রকাশ করার প্রয়োজন অনুভব করেছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষজ্ঞদের অনুমান, মানুষ প্রথমে 'অর্ডিনাল নাম্বার'-কে অর্থাৎ, পরপর সংখ্যাগুলিকে ভাষায় প্রকাশ করতে শেখে। তারপর শুরু করে 'কার্ডিনাল নাম্বার'-এর জন্য ভাষার ব্যবহার। কার্ডিনাল নাম্বার বলতে বোঝায় কোনও পরিমাণকে সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ।

প্রায় এগারো হাজার বছর আগে মানুষ কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। ততদিনে সংখ্যা দিয়ে সৌরজগতের অনেক ব্যাপার স্যাপার, যেমন পূর্ণিমা বা অমাবস্যা কবে হবে, মানুষ হিসেব করতে শিখে গেছে। অনেক ঐতিহাসিক বলেন, আদিম মানুষের সংখ্যা দিয়ে এভাবে প্রাকৃতিক ঘটনাগুলিকে বিশ্লেষণের মাধ্যমেই বিজ্ঞানের জন্ম। আর, একটি সংখ্যার সঙ্গে অন্য সংখ্যার যে অনেক সম্পর্ক আছে, তা আবিষ্কার করে উদ্ভব হয় অঙ্কশাস্ত্র।

অঙ্কশাস্ত্র উদ্ভাবনের পর এর চর্চা শুরু হয় দ্রুতগতিতে। আফ্রিকায় প্রথম 'প্রাইম নাম্বার', অর্থাৎ ১১, ১৩, ১৭ এবং ১৯ সংখ্যাগুলি যা শুধু সেই সংখ্যা বা ১ দিয়ে বিভাজ্য, নির্দিষ্ট করা হয় খ্রীষ্টজন্মের সাড়ে আট হাজার বছর আগে। অঙ্কচর্চার গোড়ায় সংখ্যাগুলিকে কিভাবে লিখে প্রকাশ করা যায় তা নিয়ে বিস্তর সমস্যা ছিল। অক্ষর জ্ঞান তখনো মানুষের হয়নি। তাই একাজে এক এক দেশের মানুষ তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির সঙ্গে তাল রেখে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল। মিশরের অধিবাসীরা যেমন এক থেকে নয় সংখ্যা বোঝাতে লম্বা দাগ কাটতো পাশাপাশি। এক বোঝাতে একটি দাগ, দুই-এর জন্য দুটি। এভাবে নয় লিখতে নটি লম্বা দাগ কাটতো। দশের প্রকাশ করতো বৃত্ত এঁকে। প্যাচানো দড়ি এঁকে বোঝাতো একশো। একটা পদ্মফুল সমান ছিল এক হাজার। সোজা করে আঁকা একটি হাতের আঙুল ছিল দশ হাজারের চিহ্ন। এক লক্ষ বোঝাতে আঁকা হতো একটি ব্যাঙাচি। আর, যদি কোন ছবিতে দেখা যেত স্বর্গের দিকে দুহাত তুলে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কোন মানুষ, তাহলে বুঝতে হতো সংখ্যাটি দশ লক্ষ।

মিশরীয়দের এই সাংকেতিক চিহ্ন দিয়ে সংখ্যার প্রকাশ একটা উদাহরণের সাহায্য নিলে আরো ভাল বোঝা যাবে। মজাও লাগবে। ধরা যাক ৩,৬৪৭,৫৪৩ লিখে বোঝানো দরকার। এর জন্য একজন মিশরীয় পাশাপাশি পরপর আঁকতো তিনটি বিস্মিত মানুষ, ছটি ব্যাঙাচি, চারটি সোজা আঙুল, সাতটি পদ্মফুল, পাঁচটি প্যাচানো দড়ি, চারটি বৃত্ত এবং তিনটি লম্বা রেখা। পরবর্তীকালে মিশরীয়রা অঙ্ক করার জন্য প্যাপিরাসের ওপর বিন্দু ও দাগ ব্যবহার প্রচলন করে। পাথরের টুকরো ফুটো করে কাঠির মধ্যে ঢুকিয়ে গোণার জন্য ষ্টোন কাউন্টারও মিশরীয়রা তৈরি করেছিল।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের অঙ্কশাস্ত্র প্রথম শিখিয়েছিল রোমানরা। তবে রোমান সাম্রাজ্যে অঙ্কশাস্ত্র নিয়ে চর্চার অধিকারী ছিল

সম্রাটের স্থির করা মুষ্টিমেয় কিছু জ্ঞানী লোক। গণিত চর্চায় আমাদের দেশের ইতিহাসও সুপ্রাচীন। আরব দেশগুলিতেও গণিত চর্চা শুরু হয় প্রায় একই সঙ্গে। গণিত চর্চায় সারা বিশ্বে আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে 'শূন্য'-এর আবিষ্কার। শূন্য আবিষ্কার করার পর অঙ্কশাস্ত্র এবং গণনার পদ্ধতি নতুন মোড় নেয়। অঙ্কে শূন্যের ব্যবহার খুব সম্ভবত শুরু হয়েছিল ৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে। ভারতের থেকে দশমিক পদ্ধতি ও শূন্য ব্যবহার শিখে উন্নত হয় আরবদের গণিত চর্চা। ভারত থেকে অঙ্ক শিখে দেশে ফিরে বিখ্যাত আরবী গণিতজ্ঞ আল-খোয়ারিজিমি ৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে 'আল-জাবর-ওয়াল মুকাব্লা' নামে একটি অঙ্কের বই লেখেন। এই বইয়ের নাম থেকেই পরবর্তী সময়ে 'অ্যালজেব্রা' শব্দটির উদ্ভব হয়।

আরব দেশে গণিত চর্চার স্বর্ণযুগে ইহুদি ও পার্শিরাও অংশগ্রহণ করেছিল। পার্শিয়ান গণিতজ্ঞ জামসিদ বেন মাসুদ বেন মাহমুদ ঘিয়াতেদ্দিন আল কাশী (১৩৯৩-১৪৪৯), খুব সম্ভবত, চীন থেকে অঙ্ক করার দশমিক ভগ্নাংশ পদ্ধতি শিখে সারা বিশ্বে প্রচলন করেন। টু পাই (2 pi) সমান ৬.২৮৩১৮৫৩০৭১৭৯৫৮৬৫— এইহিসেব আল কাশীই প্রথম করেছিলেন। ট্রিগোনোমেট্রির চর্চাতেও আল কাশীর অনেক অবদান আছে। এছাড়া আল কাশী এমন কয়েকটি যন্ত্র তৈরি করেছিলেন যা দিয়ে গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান ও চন্দ্র গ্রহণের সঠিক তারিখ নির্ণয় করা যেত।

গণিত চর্চার নিত্যনতুন পদ্ধতিগুলি আরব দেশ থেকে স্পেনের মধ্য দিয়ে ইউরোপে গিয়েছিল। আরবরা কিন্তু এটা চায়নি। তাদের ইচ্ছা ছিল নিজেদের অর্জিত বিদ্যা নিজেদের মধ্যে রাখার। অঙ্কশাস্ত্রে আরবীয় নোটেশান বা চিহ্নগুলি ইউরোপে প্রচলনের কাজে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন অ্যাডেলার্ড অব বাথ। এই আরবী চিহ্নগুলিকে বলে 'এ্যালগোরিজম'। মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কারের পর এই এ্যালগোরিজম দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপে। ভেনিসে ১৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ছাপা হয়েছিল পাটিগণিতের বই।
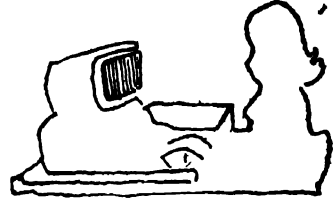
যন্ত্রগণক থেকে কমপিউটার

ঐতিহাসিকরা গবেষণা করে দেখেছেন, সুপ্রাচীন কাল থেকেই বিভিন্ন দেশের মানুষ গোণার কাজে সুবিধার জন্য কোন না কোন ধরণের যান্ত্রিক উপায়ের সাহায্য নিয়েছে। দুটি কাঠের টুকরোয় দাগ কেটে পাশাপাশি বা ওপর-নীচে রেখে স্লাইড রুল-এর মত ব্যবহার বহু পুরোনো। ষ্টোন কাউণ্টারও তাই। এই ষ্টোন কাউণ্টারকে উন্নত করেই গোণার যন্ত্র 'অ্যাবাকাস' তৈরি হয়। যদিও খ্রীষ্টপূর্ব পাঁচশো শতাব্দীতে গ্রীকরা এই প্রাচীন যন্ত্রগণক ব্যবহার শুরু করে, কিন্তু এর আবিষ্কার হয়েছিল ব্যাবিলনে। অ্যাবাকাস নামটি এসেছে ফিনিশ শব্দ 'অ্যাবাক' থেকে। প্রথমদিকে অ্যাবাকাসগুলি ছিল ভীষণ ভারী। রোমানরা এর ব্যবহার শুরু করার পর এমন ছোট অ্যাবাকাস তৈরি করেন যা সহজেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া যেত।
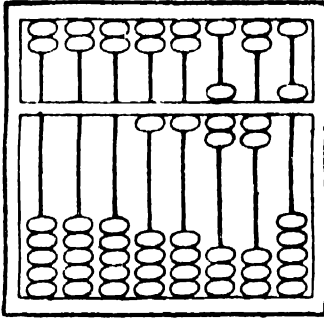
এ্যাবাকাস

IN 1492 COLUMBUS SAILED THE OCEAN BLUE

পাঞ্চড কার্ড

অ্যাবাকাস দিয়ে যোগ বা বিয়োগ করা যেত সহজেই। কিন্তু গুণ বা ভাগ করতে গেলেই হত ঝামেলা। এই ঝামেলা দূর করতে স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী জন নেপিয়ার তৈরি করেন নতুন ধরণের একটি যন্ত্রগণক যা 'নেপিয়ার'স বোনস' নামে বিখ্যাত। লগারিদম-এর জনকও এই নেপিয়ার। ১৬১৫-তে নেপিয়ার'স বোনস তৈরির ছ বছর পর উইলিয়াম অট্রেড নামে এক ইংরেজ প্রথম স্লাইড রুল তৈরি করেন। স্লাইড রুলকে যদি অ্যানালগ কমপিউটারের প্রথম রূপ হিসেবে ধরা হয় তবে, অ্যাবাকাস-কে বলতে হবে ডিজিটাল কমপিউটারের আদি রূপ। স্লাইড রুল বা অ্যাবাকাস স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রগণক নয়।

প্রথম স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রগণক তৈরি করেন জার্মানীর জ্যোতির্বিদ ও গণিতবিদ উইলহেম শিকার্ড। তাঁর তৈরি যন্ত্রগণক নির্দেশ পেলে নিজ থেকেই যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ করতে পারতো। শিকার্ডের যন্ত্রগণক তৈরির পদ্ধতিতে উদ্দীপ্ত হয়ে ১৬৪২-এ ব্লেজ পাস্কাল তৈরি করলেন আরো উন্নত এক অঙ্ক কষার যন্ত্র। পাস্কালের বাবা কর আদায়কারীর চাকরি করতেন। গণিতবিদ, বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও কুশলী কারিগর পাস্কাল বাবাকে সাহায্য করার জন্যেই এই যন্ত্র তৈরি করেন। পাস্কালের যন্ত্রগণকটি প্রধানত একটি যোগ করার যন্ত্র ছিল। এরপর জার্মানীর গটফ্রিড উইলহেম ভন লিবনিজ তৈরি করেন গুণ করার যন্ত্র। এই লিবনিজই ক্যালকুলাসের আবিষ্কর্তা। অবশ্য নিউটনও আলাদাভাবে ক্যালকুলাস নিয়ে গবেষণা করেছেন একই সময়ে। আধুনিক কমপিউটারে বাইনারি পদ্ধতি ব্যবহার করার সূত্রটি লিবনিজই প্রথম দিয়েছিলেন। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে লিবনিজের যন্ত্রগণকই প্রথম তৈরি শুরু হয়। চার্লস টমাস নামে এক শিল্পপতি এ কাজে এগিয়ে এসেছিলেন। এফ. জে. বল্ডউইন নামে এক ইংরেজ লিবনিজের যন্ত্রগণককে পরে আরো উন্নত করে তোলেন। রড ও চাকা ব্যবহার করে যন্ত্রগণক তৈরির যে পদ্ধতি লিবনিজ আবিষ্কার করেছিলেন, সত্তর দশকে ইলেকট্রনিক ক্যালকুলেটার তৈরির আগে পর্যন্ত তাই চালু ছিল।

১৮০১-এ প্রথম শুরু হয় বোণার কাজে পাঞ্চকার্ড ব্যবহার। জ্যাকার্ড নামে এক ফরাসী যন্ত্রবিদ যন্ত্রচালিত তাঁতে সুতোর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে এই পাঞ্চকার্ড ব্যবহার করেন। চার্লস ব্যাবেজ তার 'এ্যানালিটিকাল ইঞ্জিন'-এ এই পাঞ্চকার্ড পদ্ধতি ব্যবহার করেই প্রথম ডিজিটাল কমপিউটার তৈরির চেষ্টা করেছিলেন।

ব্যাবেজের পর আমেরিকার হেরমান হোলেরিথ ১৮৯০-এ আমেরিকার জনগণনার তথ্য (সেনসাস ডাটা) বিশ্লেষণের জন্য যে যন্ত্র তৈরি করেছিলেন

তাতে এই পাঞ্চকার্ড পদ্ধতি খুব সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করেন যার ফলে জন-গণনার তথ্য বিশ্লেষণ আগের বারের চেয়ে তিন-চতুর্থাংশ কম সময়ে করা সম্ভব হয়েছিল। ১৯৫০-এ ইলেকট্রনিক কমপিউটার তৈরির আগে পর্যন্ত হোলেরিথের তৈরি যন্ত্রগণক বহু কাজেই ব্যবহৃত হতো।

ইলেকট্রনিক কমপিউটার তৈরির প্রচেষ্টা শুরু হয় সামরিক প্রয়োজন মেটাতে। এর প্রথম পদক্ষেপ ১৯৪৩-এ তৈরি 'এনিয়াক' (ENIAC)। পুরো নাম, 'ইলেকট্রনিক নিউমেরিকাল ইন্টিগ্রেটর এণ্ড ক্যালকুলেটার'। এর ছ বছর পর ইংল্যাণ্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করে 'য়েডস্যাক' (EDSAC) বা 'ইলেকট্রনিক ডিলে ষ্টোরেজ অটোমেটিক ক্যালকুলেটার' যা অনেকের মতে প্রথম ইলেকট্রনিক কমপিউটার। আমেরিকানরা দাবী করেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৪৪-এ প্রথম ইলেকট্রনিক কমপিউটার তৈরি হয়েছিল। কে জানে, কোন দাবীটা সঠিক?
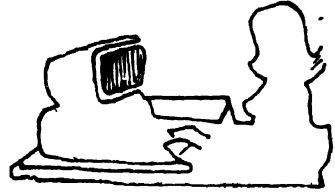
কমপিউটার জনক চার্লস ব্যাবেজ

১৭৯১ সালের ২৬শে ডিসেম্বর ইংল্যাণ্ডের ডেভনশায়ারে আধুনিক কমপিউটারের জনক চার্লস ব্যাবেজ-এর জন্ম হয়। চার্লস-এর বাবা বেনজামিন ছিলেন লণ্ডনের এক ব্যাংকের ম্যানেজিংপার্টনার। ঠাকুরদা ছিলেন স্বর্ণকার। ছোটবেলা থেকেই সব ঘটনার কারণ জানার অভ্যাস ছিল চার্লসের। কৌতূহল ছিল অসীম। স্বাস্থ্য ভাল না হলেও বুদ্ধি ছিল প্রখর। অঙ্ক ছিল পড়ার প্রিয় বিষয়। স্কুলের গণ্ডী পেরিয়ে ১৮১০-এর অক্টোবর মাসে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হন তিনি। এই কলেজে পড়ার সময়েই ব্যাবেজ অঙ্ক কষার যন্ত্র তৈরির কথা প্রথম ভাবেন।

নিজের ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে গিয়ে ব্যাবেজ সম্পূর্ণ নিজের নকশায় প্রথমে একটি ডিফারেন্স ইঞ্জিন তৈরি করেন। অঙ্ক শাস্ত্রের "মেথড অব ডিফারেন্সেস" সূত্র ভিত্তি করেই তৈরি হয়েছিল ডিফারেন্স ইঞ্জিন। এই ইঞ্জিন তৈরি করে ব্যাবেজ সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তিনি নিরন্তর গবেষণা চালাতে লাগালেন এমন একটি যন্ত্র তৈরির জন্য যা সব ধরণের অঙ্ক করবে নিভু́ল এবং ছেপে দিতে পারবে তথ্যের সারণীগুলি। এই গবেষণায় সাহায্য হিসেবে তিনি সরকারের কাছে আবেদন করে পেয়েছিলেন প্রয়োজনীয় অর্থ। রয়াল অ্যাস্ট্রোনমিকাল সোসাইটি ও রয়াল সোসাইটির সভারা তাকে দিয়েছিলেন উৎসাহ।

ব্যাবেজ নিশ্চিত ছিলেন তাঁর স্বপ্নের যন্ত্রগণক তৈরিতে তিনি একদিন সফল হবেনই। গবেষণার প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান হবার পর তিনি জোসেফ ক্লিমেণ্ট ও সি. জি. জার্ভিস-কে সঙ্গে নিয়ে নিবিড়ভাবে কাজ শুরু করলেন। প্রথম দিকে তার কাজ সেরকম সফল হল না। চারদিকে ব্যাবেজের ব্যর্থতার কথা রটে গেল। সরকারী অর্থ অপব্যায়ের জন্য সমালোচনাও হল বিস্তর। ব্যাবেজ কিন্তু এসবে দমলেন না। ড্রাফটসম্যান জার্ভিসকে দিয়ে নতুন করে যন্ত্রের ডিজাইন করিয়ে সুদক্ষ কারিগর ক্লিমেণ্টকে দিয়ে তাঁর স্বপ্নের যন্ত্রগণক বানাবার কাজে লেগে রইলেন। হঠাৎ কিছুদিন পর ক্লিমেণ্ট-এর সঙ্গে টাকা পয়সা নিয়ে বিরোধ দেখা দিল। ক্লিমেণ্ট কাজ ছেড়ে চলে গেলেন। সঙ্গে নিয়ে গেলেন ব্যাবেজের নিজস্ব চিন্তাধারায় তৈরি অনেক যন্ত্রাংশ। ক্লিমেণ্ট কাজ ছেড়ে এভাবে চলে যাওয়ায় ব্যাবেজের গবেষণা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হল। বিজ্ঞানী হিসেবে উত্তরোত্তর সুনাম বৃদ্ধি এবং সমাজের উচ্চবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী মহলে দ্রুত পরিচিতি তাঁকে খানিকটা সান্ত্বনা দিলেও, যন্ত্রগণক তৈরির স্বপ্ন তিনি কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছিলেন না। পারিবারিক জীবনেও ক্রমশ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই ব্যাবেজকে ছেড়ে চিরতরে চলে গেলেন তার স্ত্রী, দুই সন্তান ও পিতা। ঠিক এই সময়ে এক পার্টিতে ব্যাবেজের সঙ্গে পরিচয় হয় কবি লর্ড বায়রনের কন্যা অগাষ্টা আডা-র। আডা নিজেও অঙ্ক শাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যায় খুবই পারদর্শী ও অনুরক্ত ছিলেন।

প্রধানত আডার অনুপ্রেরণাতেই ব্যাবেজ আবার তাঁর যন্ত্র তৈরির কাজে হাত দেন। অনেকে বলেন, ব্যাবেজের এ্যানালিটিকাল ইঞ্জিনের নতুন ডিজাইন তৈরির কাজে আডা প্রচুর সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু ব্যাবেজের জীবনীকার

এ্যান্থনি হাইম্যান এ কথা মানতে রাজি হননি। যাহোক, আডার অনুপ্রেরণা পেলেও ব্যাবেজ তাঁর কাজে বিশেষ এগোতে পারছিলেন না। কারণ, অর্থাভাব। পিতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী হিসাবে যে অর্থ পেয়েছিলেন গবেষণার কাজে ইতিমধ্যেই তা খরচ করে ফেলেছেন। সাহায্যের জন্য আবার সরকারের দ্বারস্থ হলেন। সাহায্যও পেলেন। ১৮৪৮ নাগাদ এ্যানালিটিকাল ইঞ্জিনের ডিজাইনও তৈরি করলেন নির্ভুলভাবে। কিন্তু মনের মত করে যন্ত্রটি তৈরি করতে পারলেন না।

ব্যাবেজের এই ব্যর্থতার কারণ সে সময়ে এখনকার মত সূক্ষ্ম যন্ত্রাংশ তৈরির প্রযুক্তি ছিল না। ব্যাবেজের চিন্তাভাবনা ছিল সময়ের চেয়ে অনেক এগিয়ে। সম্পূর্ণ ধাতব যন্ত্রাংশ দিয়ে ব্যাবেজ যে যন্ত্র তৈরি করেন তাতে অনেক ঘাটতি ছিল। কিন্তু এ্যানালিটিকাল ইঞ্জিনের যে ডিজাইন বা গঠনতত্ত্ব ব্যাবেজ তৈরি করেছিলেন তার থেকে অনেকটাই আধুনিক ইলেকট্রনিক কমপিউটার তৈরিতে কাজে লাগানো হয়েছে। এজন্যেই চার্লস ব্যাবেজকে বলা হয় আধুনিক কমপিউটারের জনক।

ডিফারেন্স ও এ্যানালিটিকাল ইঞ্জিন ছাড়াও চার্লস ব্যাবেজ আরো কিছু যন্ত্র তৈরি করেছিলেন যার মধ্যে অপথ্যালমোস্কোপ আজও চক্ষু চিকিৎসকদের কাছে চক্ষু পরীক্ষার এক অপরিহার্য যন্ত্র। সঙ্গীত প্রীতি ও ব্যালে লেখার জন্যেও ব্যাবেজকে অনেকে চিনতেন। তাঁর আত্মজীবনী 'প্যাসেজেস ফ্রম দি লাইফ অফ এ ফিলজফার' পড়লে বোঝা যায় এই বিজ্ঞানীর লেখার হাত কত সুন্দর ছিল। ১৮৭১-এর ১৮ অক্টোবর চার্লস ব্যাবেজ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর পর কবর দেবার আগে ব্যাবেজের মস্তিষ্ক বের করে নেওয়া হয় পরীক্ষার জন্য। আশ্চর্যের বিষয়, পরীক্ষা করে কিন্তু এই প্রতিভাবান বিজ্ঞানীর মস্তিষ্কে অসাধারণত্ব কিছুই পাওয়া যায়নি। ইংল্যাণ্ডের রয়েল কলেজ অফ সার্জেনসে তাঁর মস্তিষ্কটি এখনো সংরক্ষিত আছে।

কমপিউটারের কার্যক্ষমতার ওপর খুবই আস্থা ছিল ব্যাবেজের। মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে এর অবদান সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। ব্যাবেজ একবার বলেছিলেন, তিনি যে কোনও দিন মরতে রাজি আছেন যদি পাঁচশো বছর পর কমপিউটার ব্যবহার করে পৃথিবীর অগ্রগতি দেখার জন্য কেউ তাঁকে তিন দিনের জন্য এই পৃথিবীতে আসার ব্যবস্থা করে দেয়। ব্যাবেজ কখনো

ভাবতে পারেননি, পাঁচশো বছর নয়, তাঁর মৃত্যুর একশো বছরের মধ্যেই কমপিউটার পৃথিবীতে প্রযুক্তির বিপ্লব সৃষ্টি করবে।
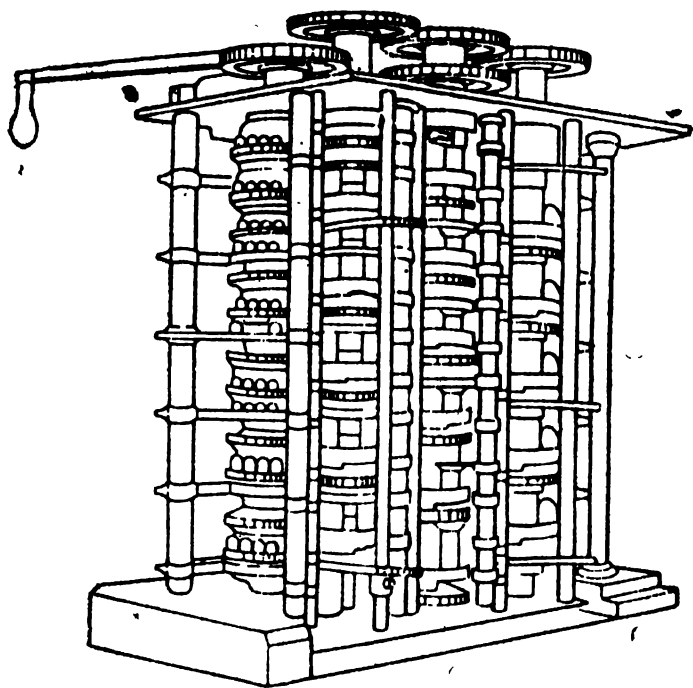
চার্লস ব্যাবেজের তৈরি ইঞ্জিন
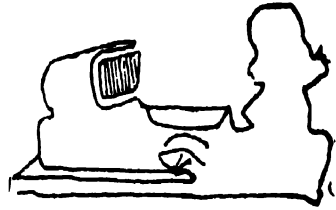
কমপিউটার আসলে কি

চলতি কথায় কমপিউটারকে বাংলায় অনেকে বলেন যন্ত্রগণক। কমপিউটার নিঃসন্দেহে একটি যন্ত্র। কিন্তু একে কি যন্ত্রগণক বলা ঠিক হবে? কমপিউটারকে বাংলায় যদি যন্ত্রগণক বলি তাহলে ক্যালকুলেটারের বাংলা কি হবে?

ইংরেজীতে কমপিউটার শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'কমপিউটেয়ার' থেকে। ল্যাটিনে 'কমপিউটেয়ার' বলতে বোঝায় 'গোণা'। অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে যখন প্রথম কমপিউটার শব্দটি যুক্ত হয়, এর অর্থ বলা ছিল 'ইলেকট্রনিক যন্ত্রগণক'। বাস্তবেও অধিকাংশ লোক, যাঁদের সঙ্গে এই যন্ত্রের পরিচয় নেই, কমপিউটার বলতে বোঝেন এমন একটি যন্ত্র যা খুব দ্রুত গুণতে পারে বা অঙ্ক করতে পারে। এই ধারণা একেবারে ভুল নয়। সত্যিই কমপিউটার খুব দ্রুত গুণতে পারে বা অঙ্ক করতে পারে। কিন্তু এ ছাড়াও কমপিউটার আরো হাজারো রকমের কাজ করে মানুষের নির্দেশে, যার মধ্যে কমপিউটারে ভরে দেওয়া 'ডাটা' ও তথ্যের

বিশ্লেষণ ও বিন্যাস অন্যতম। ইংরেজীতে একে বলে 'প্রসেসিং'। সাধারণ ক্যালকুলেটারের এই ক্ষমতা নেই। শুধু যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ও সংখ্যা নিয়ে আরো টুকটাক সামান্য কাজ ছাড়া ক্যালকুলেটার কিছুই পারে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যদি ক্যালকুলেটারকে বাংলায় যন্ত্রগণক বলি তাহলে বোধহয় ঠিক বলা হবে! ক্যালকুলেটার যদি যন্ত্রগণক হয়, কমপিউটারকে তবে কি বলবো? যতদিন না বাংলায় কমপিউটারের একটা যথার্থ নাম দেওয়া সম্ভব হচ্ছে, কমপিউটারকে কমপিউটার বললেই মনে হয় ঠিক হবে!

যে নামেই ডাকা হোক না কেন, গোলাপের মত কমপিউটারের চরিত্র একই থাকবে। কখনোই বদলাবে না। মূলত গণনার যন্ত্র হলেও, কমপিউটার এর 'মেমরি' বা স্মৃতিতে প্রচুর তথ্য সঞ্চয় করে রাখতে পারে। কমপিউটারের মেমরি আছে কিন্তু 'ব্রেইন' বা মস্তিষ্ক নেই। কোন কাজটি কমপিউটার করবে তা বাইরে থেকে চিন্তা করে নির্দেশ (প্রোগ্রামিং) দিলে তবেই কমপিউটারের স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দ্রুত গতিতে তা করে দিতে পারে। মানুষের কাছ থেকে তথ্য (ইনফরমেশন) এবং নির্দেশ (প্রোগ্রামিং) না পেলে কমপিউটার অচল। অর্থাৎ মানুষের কাজ, মানুষের থেকে দ্রুত, মানুষের নির্দেশ পেলে, তবেই কমপিউটার করতে পারে। অন্যথায় নয়।

কমপিউটারকে অনেক সময় বলা হয় 'লজিক মেশিন'। এই যন্ত্রের মধ্যে আছে 'লজিক সারকিটস' এবং 'লজিক গেটস'। সাধারণ অর্থে 'লজিক' বলতে বোঝায় চিন্তা বা তর্ক করার রীতিনীতি যা শুরু করে ধাপে ধাপে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। গ্রীক দার্শনিকরা এই 'লজিক' বা তর্ক শাস্ত্রের জন্ম দিয়েছিলেন। অঙ্ক করার সময়ও আমরা অঙ্কের নিয়ম মেনে 'ষ্টেপ বাই ষ্টেপ' বা ধাপে ধাপে করে থাকি। একে বলে 'ম্যাথমেটিকাল লজিক'। কমপিউটারের গঠন রীতি এই ম্যাথমেটিকাল লজিক-এর ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে বলে এর আর এক নাম 'লজিক মেশিন'। আজকের ডিজিটাল কমপিউটার তৈরির কাজে ইংরেজ গণিতজ্ঞ জর্জ বুল-এর সৃষ্ট ম্যাথমেটিকাল লজিক ব্যবহার করা হয় যা 'বুলিয়ান লজিক' নামে পরিচিত।

আজ পর্যন্ত কমপিউটার প্রযুক্তিবিদরা যতরকম কমপিউটার তৈরি করেছেন সেগুলিকে এ্যানালগ, ডিজিটাল ও হাইব্রিড এই তিনভাগে ভাগ করা যায়। এ্যানালগ ও ডিজিটাল কমপিউটারের মধ্যে তফাৎ এই যে, এ্যানালগ কমপিউটার সব তথ্যকে বিদ্যুৎ প্রবাহের পরিমাণ দিয়ে মেপে কাজ করে। অন্যদিকে ডিজিটাল

কমপিউটার কাজ করে গুণে (কাউন্ট করে)। কাজ করার সময় এ্যানালগ কমপিউটারের ভেতর বিদ্যুৎ প্রবাহের পরিমাণ কমে বাড়ে। ডিজিটাল কমপিউটারের ভেতর কাজ করার সময় বিদ্যুৎ প্রবাহ একই রকম থাকে। ষাটের দশকে এ্যানালগ ও ডিজিটাল কমপিউটারের গঠনতত্ত্বকে মিলিয়ে হাইব্রিড কমপিউটার তৈরি করা হয়েছিল। তবে এই যন্ত্রটি খুব কাজের হয়নি। এ্যানালগ কমপিউটারও আজকাল আর কেউ ব্যবহার করেন না। কার্যক্ষমতা ও বিভিন্ন ধরণের কাজ দ্রুত নির্ভুল করার জন্য ডিজিটাল কমপিউটারই শ্রেষ্ঠ। আজকাল যখন কেউ কমপিউটার নিয়ে আলোচনা করেন তখন নির্দ্বিধায় বুঝে নিতে হবে তিনি ডিজিটাল কমপিউটার নিয়েই কথা বলছেন।
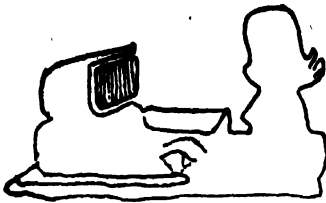
কমপিউটার কি দিয়ে তৈরি

কেউ যদি কমপিউটার দেখে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে একটা বাক্স, একটা টেলিভিশনের পর্দার মত পর্দা ও একটা কি-বোর্ড, এই তিন মিলিয়ে একটা কমপিউটার। বড় কমপিউটারে সব কিছু বড় বড়। ছোটতে ছোট। বাইরে থেকে দেখতে যেরকমই লাগুক না কেন, প্রতিটি কমপিউটারই কয়েকটি যন্ত্রাংশ (ইউনিট) দিয়ে তৈরি। এবং এই প্রতিটি যন্ত্রাংশ বিশেষভাবে নির্দিষ্ট কাজ করে। যন্ত্রাংশ বা ইউনিটগুলির ইংরেজী নাম নীচে দেওয়া হল।

(ক) সেণ্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট (C P U) : কণ্ট্রোল ইউনিট, ইমিডিয়েট এ্যাকসেস ষ্টোর বা মেইন ষ্টোর, অ্যারিথমেটিক ইউনিট, রেজিষ্টারস—এগুলি মিলিয়ে সেণ্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট তৈরি।

(খ) ইনপুট ইউনিট।

(গ) ব্যাকিং ষ্টোর।

(ঘ) আউটপুট ইউনিট।

যে কোন কমপিউটারের সেণ্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিটের পাশাপাশি বা চারধারে

অন্ত দুটি ইউনিট ও ব্যাকিং ষ্টোর ছড়িয়ে থাকে বলে এদের বলা হয় 'পেরিফেরাল ইউনিট'। অনেক কমপিউটারে, যাতে ভিডিও ডিসপ্লে ইউনিট আছে, ইনপুট ও আউটপুট একটি পেরিফেরাল ইউনিট দিয়েই হয়।

সেণ্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট তৈরি করতে লাগে হাজার হাজার ট্রানজিসটার ও অজস্র বৈদ্যুতিক সূক্ষ্ম যন্ত্রাংশ। পেরিফেরাল ইউনিটগুলি সাধারণত তৈরি হয় বিদ্যুৎচালিত সূক্ষ্ম যন্ত্রাংশ দিয়ে। মানুষের মস্তিষ্ক ও স্নায়ু সমূহ মিলিয়ে যেমন সেণ্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম, কমপিউটারের সেণ্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিটও অনেকটা তাই। এই ইউনিটেই থাকে কমপিউটারের 'মেমরি' বা স্মৃতির আধার।

কমপিউটারে পধানত দু ধরণের মেমরি থাকে। এদের সংক্ষেপে বলে 'রম' (ROM) ও র‍্যাম (RAM)। রম-এর পুরোটা হল 'রিড অনলি মেমরি'। আর, র‍্যাম বললে বোঝায় 'র‍্যাণ্ডম অ্যাকসেস মেমরি'। রম হচ্ছে স্মৃতির স্থায়ী ভাণ্ডার। রম-এ যে তথ্য দেওয়া হয় তা কখনো নষ্ট হয় না। এমনকি বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলেও নয়। এজন্য রম-কে বলা হয় 'নন ভোলাটাইল'। অন্যদিকে র‍্যাম হচ্ছে কমপিউটারের অতিরিক্ত স্মৃতি-ভাণ্ডার। চরিত্রগত বিচারে এই স্মৃতি অস্থায়ী হয়। প্রয়োজন মত কমপিউটার র‍্যাম-এর তথ্য কাজে লাগায় কিছু নির্দিষ্ট কাজের জন্য এবং এভাবে খরচ করে ফেলে। লোডশেডিং হলে বা বৈদ্যুতিক সংযোগ অন্য কোন কারণে ছিন্ন হলে, র‍্যাম অচল হয়ে যায় এবং হারিয়ে যায় এর ভেতরে ভরে দেওয়া তথ্যগুলি। র‍্যাম-কে এ কারণে বলে 'ভোলাটাইল' মেমরি।
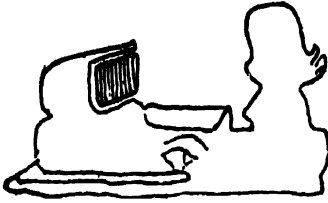
কমপিউটার কিভাবে কাজ করে

কমপিউটার কিভাবে কাজ করে তা বুঝতে হলে আগে জানা দরকার কমপিউটারের বিভিন্ন অংশ বা যন্ত্রাংশগুলির কার কি কাজ।

আগেই বলেছি যে কোন কমপিউটার প্রধানত চার অংশে বিভক্ত। এগুলি হচ্ছে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট, ইনপুট ইউনিট, ব্যাকিং ষ্টোর ও আউটপুট ইউনিট। আবার সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিটে থাকে কণ্ট্রোল ইউনিট, ইমিডিয়েট এ্যাকসেস বা মেইন ষ্টোর, অ্যারিথমেটিক ইউনিট ও রেজিষ্টারস।

কমপিউটারের কণ্ট্রোল ইউনিট বা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র এই যন্ত্রের সব কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে। কমপিউটারকে কাজ করার যে নির্দেশ বা প্রোগ্রাম দেওয়া হয়, কণ্ট্রোল ইউনিট সেই অনুসারেই সব নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

ইমিডিয়েট এ্যাকসেস বা মেইন ষ্টোর হচ্ছে কমপিউটারের প্রধান তথ্যকেন্দ্র বা

কমপিউটারের কাজ করার পদ্ধতি
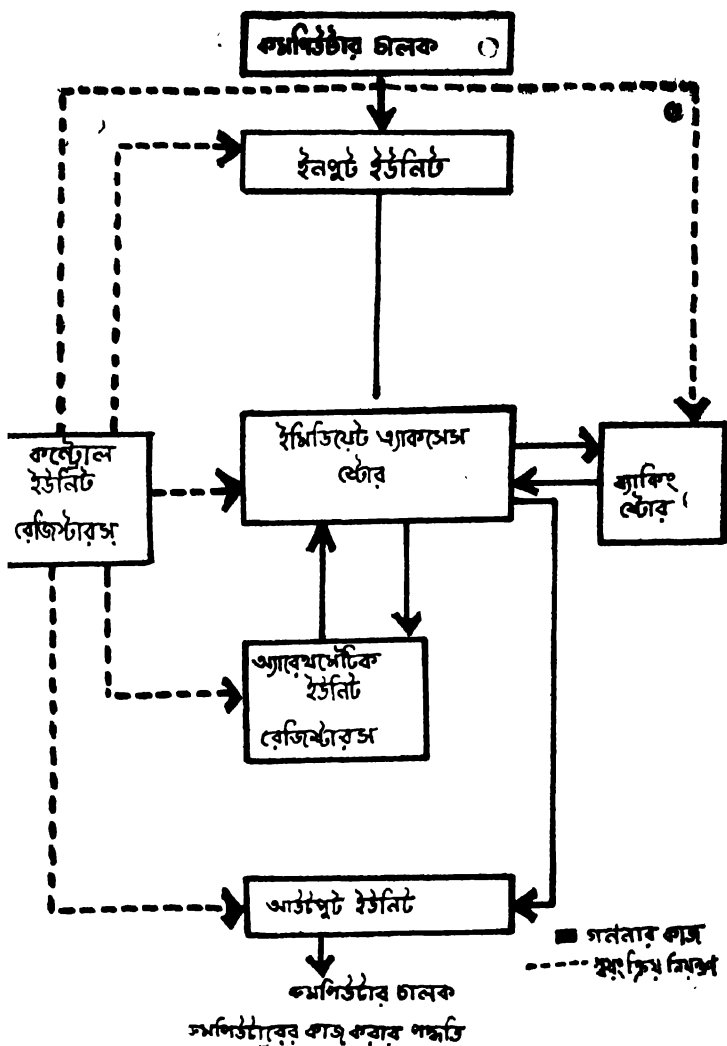
তথ্যকোষ, যেখান থেকে প্রয়োজন মত তথ্য খুব দ্রুত আহরণ করা যায়। অনেক কমপিউটারের এই তথ্যকেন্দ্র নির্দেশ পেলে এক ন্যানো সেকেণ্ডে তথ্য জানিয়ে দেয়। এক ন্যানো সেকেণ্ড হচ্ছে এক সেকেণ্ডের একশো কোটি ভাগের এক ভাগ।

এ্যারিথমেটিক ইউনিট বা গণনা কেন্দ্র কমপিউটারের আসল বা প্রধান

কাজের জায়গা। এখানে গণনা ছাড়াও তথ্য বিন্যাস, নির্বাচন ও তুলনামূলক বিচার করা হয়।

কমপিউটারের রেজিষ্টারস হচ্ছে আর এক রকমের তথ্য কেন্দ্র যেখানে গণনার জন্য তথ্যগুলি ধরা থাকে এবং নির্দেশ পেলে গণনা কেন্দ্রে পাঠায়। রেজিষ্টারস সাধারণত একাধিক থাকে এবং দরকার হলে এক রেজিষ্টার থেকে অন্য রেজিষ্টারে তথ্য পাঠানো যায়।

ইনপুট ইউনিট কমপিউটারে ধরে রাখা বা সঞ্চয়ের জন্য দেওয়া তথ্যগুলি প্রথমে পড়ে এবং বৈদ্যুতিক তরঙ্গে পরিবর্তন করে যা পরে গণনার কাজে লাগে।

ব্যাকিং ষ্টোরকে চিরস্থায়ী কোষ বলা যেতে পারে যেখানে তথ্য, দরকার হলে, ম্যাগনেটিক টেপে রেকর্ড করে বরাবরের জন্য ধরে রাখা যায়। ব্যাকিং ষ্টোরই হচ্ছে কমপিউটারের বিশাল তথ্যভাণ্ডার।

আউটপুট ইউনিট কমপিউটারের কাজের ফল জানায়। এই ফল কমপিউটার স্ক্রীনে দেখা যায় বা কমপিউটার ডিস্ক, ক্যাসেট, কার্ড অথবা কাগজে নির্দেশ মত ছেপে দেয়।

এবার দেখা যাক কমপিউটার কিভাবে কাজ করে। সংক্ষেপে বললে ব্যাপারটা এরকম হয়। প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি (ইনফরমেশন) প্রথমে বিশেষভাবে সংগ্রহ করে ইনপুট ইউনিট-এ ভরে দেওয়া হয়। ইনপুট ইউনিট এই তথ্যগুলিকে বৈদ্যুতিক তরঙ্গে রূপায়িত করে পাঠিয়ে দেয় তথ্য কেন্দ্রে বা ষ্টোরেজ ইউনিট-এ। দু ধরণের তথ্য এই ইউনিটে থাকে। এগুলি হচ্ছে 'ডাটা' বা পরিসংখ্যান এবং ইনষ্ট্রাকসনস (নির্দেশ)। নির্দেশ-কে প্রোগ্রাম-ও বলা হয়। প্রোগ্রাম অনুযায়ী কমপিউটার যখন কাজ শুরু করে, পরিসংখ্যানগুলি গণনা কেন্দ্র বা অ্যারিথমেটিক ইউনিটে চলে যায় যেখানে গণনার কাজ হয় দ্রুতগতিতে। কি ধরণের গণনা হবে, গণনার জন্য কোন কোন পরিসংখ্যান ব্যবহার করা দরকার, কত দ্রুত গণনা করতে হবে, ফলাফল কিভাবে প্রকাশ করতে হবে—এসবই নিয়ন্ত্রণ করে কণ্ট্রোল ইউনিট।

সংক্ষেপের পর বিশদভাবে কমপিউটারের কর্মপদ্ধতি বলার আগে কমপিউটার কোড কাকে বলে জানাই। মানুষ যখন মানুষের সঙ্গে কথা বলে, ভাষার ব্যবহার করে। লিখে কিছু জানাতে হলে সাহায্য নেয় অক্ষর মালার। এই ভাষা বা অক্ষর মালাকে আমরা মনের কথা বা তথ্য আদান প্রদানের 'সংকেত' বা 'কোড'

বলতে পারি। কমপিউটারেও তথ্য দেওয়ার জন্য এই কোড-এর আশ্রয় নিতে হয়। তবে মানুষের ও কমপিউটারের কোড এক নয়। অনেক সময় মানুষকে কিছু না বললে বা না লিখে দিলেও, মানুষ চোখে দেখে ব্যাপারটা বুঝে নিতে পারে। মানুষের মস্তিষ্ক এ কাজে সাহায্য করে। কিন্তু কমপিউটারের মস্তিষ্ক (ব্রেইন) নেই। ফলে নিজের থেকে কমপিউটার কিছু বোঝে না। কোড-এর মাধ্যমে তথ্য না জানালে, জানতেও পারে না। তবে একটা ব্যাপারে মানুষের সঙ্গে কমপিউটারের মিল আছে। বিভিন্ন দেশের মানুষের যেমন কথা বলার বিভিন্ন রকমের ভাষা, ভিন্ন ভিন্ন ধরণের কমপিউটারের কোডও ভিন্ন।

কোড-এর সাহায্যে কমপিউটারে তথ্য ভরার জন্য সাধারণত ব্যবহার হয় ভিস্যুয়াল ডিসপ্লে ইউনিট, পাঞ্চ কার্ড, ম্যাগনেটিক টেপ, পেপার টেপ ও ডকুমেন্ট রিডার। কার্ড ও পেপার টেপে এক বিশেষ নকশা (প্যাটার্ণ) মেনে ফুটো করা হয়। কার্ডে ফুটো করে ওপর থেকে নীচে। পেপার বা কাগজের টেপে পাশাপাশি। এই এক একটি ফুটো এক একটি অক্ষর বা সংখ্যাকে প্রতিনিধিত্ব করে। অন্য কথায়, ফুটোগুলি অক্ষর বা সংখ্যার সাংকেতিক রূপ। ম্যাগনেটিক টেপ ও ডিস্কে তথ্য লেখা হয় টাইপরাইটারের সাহায্যে।
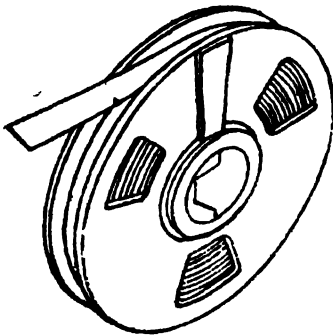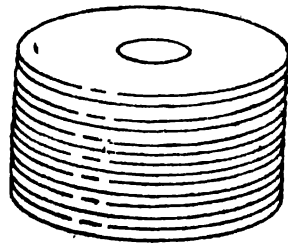
ডকুমেন্ট রিডার-এর সাহায্যে কমপিউটার মানুষের মত নিজের থেকেই তথ্য পড়ে জেনে নেয়। এই ডকুমেন্ট রিডার-এর জন্যেই আজকাল ব্যাংক চেকে নম্বর ছাপার কাজে ম্যাগনেটিক ইংক ব্যবহার করা হচ্ছে। ডকুমেন্ট রিডার মানুষের হাতের লেখাও পড়তে পারে। তবে সব সময় নয়।

কার্ড বা কাগজের টেপে তথ্য ভরে দিয়ে, অর্থাৎ পাঞ্চ (ফুটো) করে কমপিউটারের ইনপুট ইউনিটে ঢোকানো হয়। ঢোকাবার পর কমপিউটারের যান্ত্রিক পদ্ধতি ফুটোগুলি থেকে জেনে নেয় ওই কার্ড বা টেপে কি তথ্য আছে এবং তথ্যগুলিকে বৈদ্যুতিক স্পন্দনে (পালস) রূপান্তরিত করে সংগ্রহাগারে বা ষ্টোরেজ ইউনিটে পাঠিয়ে দেয়। সাধারণত কমপিউটার প্রতি মিনিটে এক হাজার কার্ড পড়তে পারে, অর্থাৎ এক হাজার কার্ডে ভরা তথ্য জেনে বৈদ্যুতিক স্পন্দনে রূপান্তরিত করতে পারে। পেপার টেপ-এর ক্ষেত্রে এই কাজের গতি হচ্ছে এক হাজার অক্ষর বা এক হাজার, এক অংকের সংখ্যা, প্রতি সেকেণ্ডে। পাঞ্চ কার্ড বা পেপার টেপ পড়ার গতি আধুনিক কমপিউটারে আরো বাড়ানোর চেষ্টা হয়েছে।

মানুষ পড়ে চোখ দিয়ে। কমপিউটারের তো চোখ নেই! তাহলে কমপিউটার কিভাবে পড়ে? চোখ না থাকলেও কমপিউটারের ভেতরে থাকে এক সারি ফটো-ইলেকট্রিক সেল। ফুটো করা পাঞ্চ কার্ড বা পেপার টেপ কমপিউটারের ভেতর ঢোকাবার পর, ফুটোর ভেতর দিয়ে আলো গিয়ে ফটো ইলেকট্রিক সেল-এর ওপর পড়ে। এই সেল তখন আলোর রেখাগুলিকে বৈদ্যুতিক স্পন্দনে (পালস) রূপান্তরিত করে। কমপিউটারের এ ছাড়া আরো এক রকমের পড়ার পদ্ধতি আছে। এই পদ্ধতিতে একটি বিদ্যুতায়িত রোলার ও অসংখ্য সরু সরু তারের সারির মধ্য দিয়ে পাঞ্চ কার্ড বা পেপার টেপটি নিয়ে যাওয়া যায়। কার্ড বা টেপ-এর ফুটোর জায়গায় তার রোলারকে স্পর্শ করে এবং বৈদ্যুতিক স্পন্দন তৈরি হয়। পরপর এই স্পন্দনগুলি ষ্টোরেজ ইউনিটে নথিভুক্ত হয়। কার্ড বা টেপ-এর যে জায়গায় ফুটো নেই সেখানে কোন স্পন্দন তৈরি হয় না।

ডকুমেণ্ট রিডার-কে অনেক ক্ষেত্রে 'ক্যারেকটার রিকগনিশন সিস্টেম' বলে। আমরা যখন কোন অক্ষর বা সংখ্যা লিখি তা একটা ছবি তৈরি করে। প্রতিটি অক্ষর বা সংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করে যে আকৃতি বা ছবিগুলি, তাদের নির্দিষ্ট চরিত্র থাকে। 'ক' বা '১' যতবারই লেখা হোক না, 'ক' বা '১'-এর আকৃতি বা ছবি সব সময়েই এক থাকবে। 'ক' কখনো 'খ'-র মত দেখাবে না। '১' কখনো '২'-এর মত নয়। এই আকৃতি বা ছবি দেখে অক্ষর বা সংখ্যা চেনার জন্য ডকুমেণ্ট রিডারে ফটো ইলেকট্রিক সেল-এর বদলে ফটো ইলেকট্রিক সেন্সর থাকে। ম্যাগনেটিক ইংক ব্যবহার করে, যে সব ব্যাংক চেক ছাপা হয় তার

অক্ষরগুলি বা সংখ্যাগুলি চৌম্বক নকশায় (ম্যাগনেটিক প্যাটার্ণ) পরিণত হয় যা ডকুমেণ্ট রিডার সহজেই পড়তে পারে।

ভিসুয়াল ডিসপ্লে ইউনিট-এর ক্ষেত্রে তথ্যগুলি প্রথমে কমপিউটারের সাথে যুক্ত টাইপরাইটারে টাইপ করে ডিসপ্লে ইউনিট-এ সাজানো হয় যেখান থেকে ষ্টোরেজ ইউনিট-এ চলে যায়।

আধুনিক কমপিউটারে পেপার টেপ বা কার্ডের বদলে ম্যাগনেটিক টেপ, ক্যাসেট ও ডিস্কেটস ব্যবহার করা হচ্ছে। টেপ দেখতে লম্বা ফিতের মত। কমপিউটারের ক্যাসেট হুবহু গানবাজনা শোনার টেপ রেকর্ডারের ক্যাসেটের মত দেখতে। ডিস্কেট দেখতে গ্রামোফোনের ছোট রেকর্ডের মত। ম্যাগনেটিক টেপ, ক্যাসেট ও ডিস্কেটস ব্যবহারের অনেক সুবিধা। এগুলি বেশ শক্ত ও মজবুত। অল্প পরিসরে বেশি তথ্য ভরা যায় এবং প্রয়োজনে সহজেই অপ্রয়োজনীয় তথ্যগুলি বের করে নেওয়া যায় বা মুছে দেওয়া যায় বা বদলও করা যা ।

ম্যাগনেটিক টেপ কমপিউটারে তথ্য ভরা ছাড়াও, ফলাফল জানানো ও তথ্য সংরক্ষণের কাজেও ব্যবহার হয়। এই টেপ-এ তথ্যগুলিকে চৌম্বক বিন্দুতে (ম্যাগনেটিক স্পট) রূপান্তরিত করে সংরক্ষণ করে। প্রতিটি টেপ-এ আট সারি চৌম্বক বিন্দু সাজানো সম্ভব।

যে কোন তথ্য কমপিউটার পড়ার পর ষ্টোরেজ ইউনিটে পাঠিয়ে দেয় সংগ্রহের জন্য। এই সংগ্রহ করাকে কমপিউটার পরিভাষায় বলে 'রাইটিং'। তবে কমপিউটার পেন বা পেনসিল দিয়ে লেখে না। তার বদলে ব্যবহার করে বৈদ্যুতিক স্পন্দন। লেখার জন্য খাতারও দরকার হয় না। কমপিউটার লেখে স্মৃতিপটে। আর, কমপিউটারের স্মৃতিই হচ্ছে এর 'মেমরি' যা আসলে বৈদ্যুতিক তথ্য ভাণ্ডার বা তথ্য কেন্দ্র। আধুনিক কমপিউটারগুলির অনেক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কমপিউটারের ষ্টোরে অজস্র তথ্য ধরে রাখার ক্ষমতা, যা দরকার হলে ব্যবহার করে আবার ষ্টোরে ফেরত দেওয়া যায়। অনেকটা লাইব্রেরী থেকে বই এনে পড়ার মত ব্যাপার আর কি!

কমপিউটার ষ্টোর সম্পর্কে আরো বলার আগে, 'কমপিউটার ওয়ার্ডস', 'বিটস' এবং 'এ্যাড্রেসেস' সম্পর্কে আগে বলে নিই।

বাইনারি ডিজিটস-এর এক বিশেষ সাজানোর ধরণকে কমপিউটারের পরিভাষায় বলে কমপিউটার ওয়ার্ড। বাইনারি ডিজিটস কাকে বলে তা অঙ্ক

অধ্যায়ে দেওয়া আছে। যে কোন একটি বাইনারি ডিজিটকে 'বিট'-ও বলা হয়। 'Binary'-র 'Bi' ও 'Digit'-এর 't' মিলিয়ে 'Bit'। কোন অক্ষর বা সংখ্যার লেখায় যে সংখ্যক বিটস প্রয়োজন হয় তাকে বলে 'বাইট'। সাধারণত আটটি বিটস মিশিয়ে একটি বাইট হয়। বিটস-এর সংখ্যা দিয়ে কমপিউটার ওয়ার্ডের 'ওয়ার্ড লেন্থ' বা শব্দ দৈর্ঘ্য মাপা হয়। কোন কমপিউটার ওয়ার্ডের ওয়ার্ড লেন্থ কত হবে তা নির্ভর করে কি ধরণের কমপিউটার তার ওপর।

কমপিউটারের সেণ্ট্রাল প্রসেসর কয়েক লক্ষ কমপিউটার ওয়ার্ডস সংরক্ষণ করতে পারে। তবে সাধারণ কাজের জন্য ব্যবহৃত অধিকাংশ কমপিউটারে এই সংরক্ষণ ক্ষমতা ষোলো থেকে আড়াই লক্ষ পর্যন্ত হয়। কোনো একটি গণনার কাজে প্রয়োজন মত কমপিউটার ওয়ার্ডস বেছে নিতে হয়। সেণ্ট্রাল প্রসেসরের ষ্টোরটি অনেক খোপে (কম্পার্টমেণ্ট অথবা লোকেশন) বিভক্ত। প্রতি লোকেশনে থাকে একটি করে কমপিউটার ওয়ার্ড যা চিহ্নিত হয় ক্রমাঙ্ক দিয়ে এবং এই কমপিউটার ওয়ার্ড-এর চিহ্নকে বলে 'এ্যাড্রেস'।

কমপিউটার ওয়ার্ডস দু ধরণের হয়। 'ইনষ্ট্রাকশন ওয়ার্ডস' যা কমপিউটারকে বলে কি করতে হবে। 'ডাটা ওয়ার্ডস' কমপিউটারের সেই সব সংখ্যাকে বলে যেগুলি কমপিউটার গণনার কাজে ব্যবহার করে। ইনষ্ট্রাকশন ওয়ার্ডস-এর দুটো ভাগ থাকে। প্রথম ভাগে থাকে 'অপারেশন কোড (op. code) যা আসলে কমপিউটারকে যে কাজ করতে হবে তার সাংকেতিক সংখ্যা। দ্বিতীয় ভাগে থাকে কমপিউটার যেসব ডাটা ওয়ার্ডস নিয়ে গণনা করবে তার এক বা একাধিক এ্যাড্রেস। কোন একটি গণনার কাজে সাধারণত একটি বা দুটি এ্যাড্রেস ব্যবহার করতে হয়। কখনো কখনো তিনটিও লাগে।

কমপিউটারের দ্রুত গণনার ক্ষমতা (ক্যালকুলেটিং স্পিড) নির্ভর করে নির্দেশ পাবার পর ষ্টোর থেকে গণনার প্রয়োজনীয় সংখ্যা এ্যারিথমেটিক ইউনিটে নিয়ে এসে গণনা করে ফলাফল জানাতে কত সময় লাগে তার ওপর। কমপিউটারের গণনার ক্ষমতা বাড়াবার জন্য সেণ্ট্রাল প্রসেসরের ষ্টোর 'ফেরাইট রিং' দিয়ে তৈরি করা হয়। এক একটি রিং-কে বলে 'কোর' যা বাইনারি ডিজিটসের ১ অথবা 0, দুটি সংখ্যার একটির প্রতিনিধিত্ব করে। এই কোরগুলির ভেতর দিয়ে তারের বন্ধনী তৈরি করা হয়। কোর-এর অবস্থানগত পরিবর্তনকে বলে 'সুইচিং' যা কোরের সঙ্গে লেগে থাকা দুটি তারের মধ্যে বিদ্যুৎ তরঙ্গ প্রবাহিত করে করা হয়। প্রতিটি কোরের মধ্য দিয়ে যায় তিনটি তার। এই তৃতীয় তারকে বলে 'সেন্স

'ওয়্যার'। এই তারের সাহায্যে কমপিউটার ষ্টোরে রাখা তথ্যগুলিকে সনাক্ত করে (রিড দি ইনফরমেশন)। কমপিউটার প্রয়োজন হলে সমস্ত 'কমপিউটার ওয়ার্ড'-কে একই সঙ্গে কাজে লাগাতে পারে। এটা সম্ভব হয় কমপিউটারের সেণ্ট্রাল প্রসেসরের ষ্টোর ম্যাগনেটিক কোর ষ্টোরস হওয়ায়। এই ম্যাগনেটিক কোর ষ্টোরকে 'ইকুয়াল টাইম ষ্টোরস' বা 'র‍্যানডাম এ্যাকসেস ষ্টোরস'-ও বলে। সবগুলি কমপিউটার ওয়ার্ডস-কে একসঙ্গে কাজে লাগাতে পারে বলেই কমপিউটার প্রতি সেকেণ্ডে কয়েক লক্ষ যোগ করতে পারে। অত্যাধুনিক কমপিউটারগুলিতে
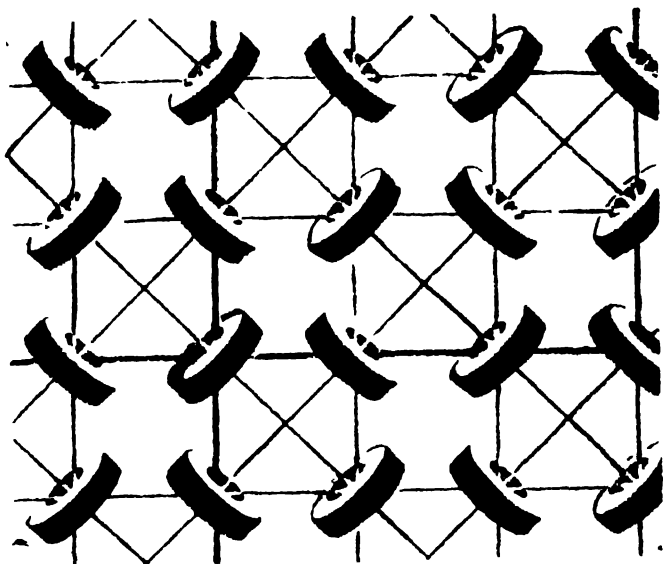
ম্যাগনেটিক কোর ষ্টোর

ফেরাইট রিং-এর বদলে সিলিকন চিপস কোর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই সিলিকন চিপস-কে বলে 'ইলেকট্রনিক কোর' বা 'মেটাল অক্সাইড সেমি-কণ্ডাকটরস' (MOS)।

যে কোন কমপিউটারের ভেতরেই কাজ হয় অসংখ্য ছোট ছোট বৈদ্যুতিক স্পন্দন (ইলেকট্রিক পালস) তৈরির মাধ্যমে। এক একটি স্পন্দনের স্থায়িত্ব হয় এক সেকেণ্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময়। স্পন্দনগুলি তৈরি হয় পরপর অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। এক রেজিষ্টার থেকে আর এক রেজিষ্টারে যে তারের মাধ্যমে স্পন্দন প্রবাহিত হয় তাকে বলে 'হাইওয়ে'। প্রতিটি রেজিষ্টারের মুখে

থাকে একটা করে ইলেকট্রনিক সুইচ যার নাম 'গেট'। এই গেট স্থির করে কোন স্পন্দন রেজিষ্টারে ঢুকবে ও কোনটা ঢুকবে না।

এ্যারিথমেটিক ইউনিট কমপিউটারে গণনার কাজ করে। এই কাজের জন্য কমপিউটারের ভেতরে থাকে বহু ইলেকট্রনিক সারকিট যা ইনপুট কার্ড বা টেপ-এর মাধ্যমে দেওয়া তথ্য ও নির্দেশ গণনার প্রয়োজনে লাগায়। গণনার জন্য, বিশেষ করে জটিল গণনার কাজে, কমপিউটার প্রথমে সরলীকরণ করে একটি জটিল গণনাকে পরপর অনেকগুলি ছোট ছোট গণনার কাজে ভাগ করে নেয়। তারপর যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ করে এই গণনার কাজগুলি সারে।

সব ধরণের গণনার কাজ কমপিউটার করে দুটি সংখ্যা, ১ ও ০ দিয়ে। এই দুটি সংখ্যা দিয়ে গণনা করাকে বলে 'বাইনারি' পদ্ধতি। আমরা নিজেরা গণনা করি ১ থেকে ০, এই দশটি সংখ্যা দিয়ে অর্থাৎ দশমিক পদ্ধতিতে। বাইনারি পদ্ধতির গণনায় যে দুটি সংখ্যা ব্যবহার হয় তাকে বলে 'বাইনারি ডিজিটস'। অর্থাৎ, ১ ও ০ বাইনারি ডিজিটস। এই বাইনারি ডিজিটস কমপিউটার বোঝে স্পন্দন তৈরির মাধ্যমে। একটি পালস বা স্পন্দন সমান এক। নো পালস বা স্পন্দনহীন একবার হওয়ার অর্থ শূন্য।

এ্যারিথমেটিক ইউনিট কি ধরণের গণনা কোন সংখ্যা বা তথ্য দিয়ে করবে তা নির্ভর করবে কমপিউটারকে কি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার ওপর। অন্য কথায় কি ধরণের প্রোগ্রাম করা হয়েছে তার ভিত্তিতে। নির্দেশ পাবার পর কমপিউটার প্রথমে প্রতিটি নির্দেশ চকিতে বুঝে নেয় এবং তারপর কাজ শুরু করে। নির্দেশ পাবার পর থেকে ফলাফল জানানো পর্যন্ত কমপিউটারের ভেতরে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে 'কন্ট্রোল ইউনিট'। কন্ট্রোল ইউনিট কাজ করে বিভিন্ন যন্ত্রাংশে এক বিশেষ ধরণের সংকেত (সিগনাল) পাঠিয়ে। এই সংকেত পাঠানোকে নিয়ন্ত্রণ করে 'কমপিউটার ক্লক'।

কমপিউটারের কাজের শেষ পর্যায় হচ্ছে ফলাফল জানানো। এই ফলাফল কমপিউটার কাগজে ছেপে, টেপে বা ডিস্কে অথবা স্ক্রীনের (VDU) মাধ্যমে জানাতে পারে। কিভাবে জানাবে, তা নির্ভর করবে ব্যবহারকারীর কি ধরণের কমপিউটার আছে এবং তিনি কিভাবে জানতে চান তার ওপর। কাগজে ফলাফল ছাপতে হলে কমপিউটারের সাথে একটি প্রিণ্টার লাগাতে হয়।

কমপিউটারের সাথে দু ধরণের প্রিণ্টার ব্যবহার করা হয়। এক ধরণের প্রিণ্টারে থাকে ১৩২টি বা আরও বেশি চাকা। প্রতিটি চাকায় থাকে

ইংরেজি বা অন্য কোন ভাষায় ব্যবহৃত একটি অক্ষর অথবা এক থেকে শূণ্য পর্যন্ত দশটি সংখ্যার একটি। চাকা ও প্রিন্টার রিবনের মাঝখানে থাকে কাগজ। কমপিউটারের নির্দেশমত প্রতিটি চাকা ঘোরে এবং নির্দিষ্ট অক্ষর বা সংখ্যা কাগজের গায়ে ধাক্কা দিয়ে ছাপ ফেলে। দ্বিতীয় ধরনের প্রিন্টার-এ জেরোগ্রাফি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।
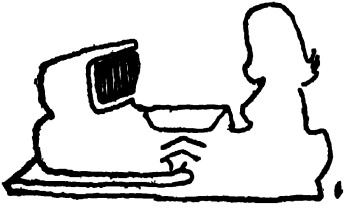
কমপিউটার কি কি কাজ পারে

আগেই বলেছি প্রধানত যুদ্ধের প্রয়োজনে প্রথম কমপিউটার তৈরির প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিবদমান পক্ষগুলি এমন সব উন্নত মানের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করেছিল যেগুলিকে ঘায়েল করা সহজ ছিল না। শত্রুর প্লেন বা সাবমেরিন কোনদিক থেকে ধেয়ে আসছে তা রেডার-এর মাধ্যমে জেনে সঠিক দিক নির্ণয় করে ও গতিবেগ জেনে খুব দ্রুত অঙ্ক কষে তারপর নির্ভুল লক্ষ্যে আঘাত হানতে হতো। সাধারণ ক্যালকুলেটার দিয়ে খুব দ্রুত এ ধরণের জটিল অঙ্ক কষা সম্ভব ছিল না সে সময়। এখনো নয়। বিশেষ করে, রেডারের তথ্য বা পরিসংখ্যান থেকে সরাসরি অঙ্ক কষা বা গণনা করার জন্য দরকার খুব দ্রুত কাজের ক্ষমতা সম্পন্ন যন্ত্রগণকের।

যুদ্ধের প্রয়োজনে বিজ্ঞানের অনেক আবিষ্কারই পরবর্তী সময়ে ধ্বংসের চেয়ে মানব কল্যাণের কাজেই বেশি ব্যবহার হয়েছে। কমপিউটারের ক্ষেত্রেও

ব্যাপারটা তাই। আজকের যুগের কমপিউটার ব্যবহারের চিত্রটা এক নজর দেখলে সত্যিই বিস্ময়ে অবাক হতে হয়। মানুষ কমপিউটারকে দিয়ে কি কাজ না করাচ্ছে? শুধু গণনা বা অঙ্ক কষার জন্য যে যন্ত্র তৈরি করা হয়েছিল সেই যন্ত্র আজ ঘরের কাজ করা, হিসেব রাখা, রুগির রোগ বলে দেওয়া, মহাকাশযান চালানো, দাবা খেলা, যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ, ব্যবসায় লাভজনক পদ্ধতি স্থির করা, কারখানায় যন্ত্রপাতি চালানো প্রভৃতি অসংখ্য কাজ করছে। মানব সভ্যতার উন্নয়নে ও নিয়ন্ত্রণে কমপিউটারের ভূমিকা আজ অপরিসীম। কমপিউটার শুধু যে দ্রুত কাজ করে তাই নয়। এই দ্রুত কাজের ফলে সময়ের সাশ্রয় হয়, খরচ কমে ও কাজ হয় নির্ভুল, নিখুঁত। কমপিউটারের কাজের আর একটি দিক হচ্ছে, এই যন্ত্র চোখের আড়ালে নীরবে কাজ করে। সর্বাধুনিক কমপিউটার-গুলি সূক্ষ্ম ভাস্কর্য খোদাই করা, আলোর গতিতে খবরাখবর পাঠানো, আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেবার মত জটিল কাজও করছে। উকিলদের পুরোনো তথ্য জোগানো, আয়কর অথবা বীমার হিসেব কষা, দাবা খেলা, এ সব তো এখন কমপিউটারের কাছে জলভাত। ছোটদের জন্য তৈরি 'কমপিউটার কিট' অঙ্ক, বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস—সব বিষয় পড়তেও সাহায্য করে। 'কমপিউটার গেমস' ছোটদের খুবই প্রিয়।

কমপিউটার নিয়ে গবেষণা যত এগিয়ে যাচ্ছে, এই যন্ত্রের কাজের পরিধি ততই বাড়ছে। আগামী দিনে যদি এমন হয়, মানুষের সব কাজই কমপিউটার করে দেয়, তাহলে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।
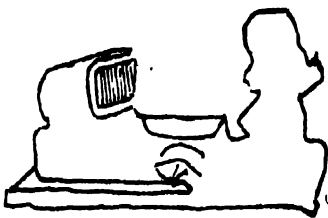
বাইনারি ডিজিটস

আগেই বলা হয়েছে সব ধরণের গণনার কাজ কমপিউটার করে দুটি সংখ্যা দিয়ে। এই সংখ্যা দুটি হচ্ছে ১ ও ০। দুই সংখ্যা দিয়ে গণনা করাকে বলে 'বাইনারি' পদ্ধতি। আর, ১ ও ০-কে বলে 'বাইনারি ডিজিটস'। আমরা নিজেরা গণনা করি ১ থেকে ০, এই দশটি সংখ্যা দিয়ে দশমিক পদ্ধতিতে। 'বাইনারি' একটি ল্যাটিন শব্দ যার অর্থ 'দুই'।

বাইনারি ডিজিট-কে সংক্ষেপে বলে 'বিট'। কতগুলি বিটস একসঙ্গে হলে বলে 'বাইট'। কমপিউটার মেমরি-র ক্ষমতা এই বাইটস দিয়ে মাপা হয়। আর, তা বোঝানো হয় 'K' দিয়ে। এক 'K' সমান ২^{১০} অথবা ১০২৪। যদি কেউ বলেন তাঁর কমপিউটার '16K' বা '১৬কে' মেমরি শক্তি সম্পন্ন, তাহলে বোঝাবে তাঁর কমপিউটারে ১৬×১০২৪ বা ১৬,৩৮৪ বাইটস মেমরি আছে। যে কমপিউটার মেমরির 'K' যত বেশি হবে, সেই কমপিউটার তত বেশি কাজ করতে পারবে।

কমপিউটার নিয়ে কাজ করার জন্য দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় পরিবর্তন করতে হয়। না করলে তো কোন গণনার কাজ করা যাবে না। এই পরিবর্তনের একটা ছক নীচে দেওয়া হল।

দশমিক	বাইনারি
০	০
১	১
২	১০
৪	১০০
৮	১০০০
১৬	১০০০০
৩২	১০০০০০

ওপরের ছকটি দেখার পর স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগবে এটা কি করে হল, অর্থাৎ দশমিকের ২ বাইনারিতে ১০ কি করে হয়? ব্যাপারটা এবার বুঝিয়ে বলি।

দশমিক পদ্ধতিতে আমরা যখন গণনা করি, কোন সংখ্যাকে বাঁ দিকে এক ঘর সরালে তার মান দশগুণ বেড়ে যায়। ধরা যাক প্রথম সংখ্যাটি ছিল ১। এখন ১-এর জায়গায় একটি ০ বসিয়ে ১-কে যদি বাঁ পাশে আনি তাহলে হবে ১০ অর্থাৎ ১-এর ১০ গুণ। এভাবে দশমিক পদ্ধতিতে ১ সমান ১, ১০ সমান ১-এর ১০ গুণ এবং ১০০ সমান ১-এর ১০ গুণ-এর ১০ গুণ।

বাইনারি পদ্ধতিতে এই ১-কে যদি একঘর বাঁদিকে সরাই তাহলে তা দশমিকে ১০ গুণের পরিবর্তে ২ গুণ হবে। অর্থাৎ, দশমিকের ১০ সমান বাইনারির ২। উল্টো করলে বাইনারির ১০ সমান দশমিকের ২। এভাবে দশমিকের ১, ১০, ১০০···সমান বাইনারির ১, ২, ৪···। নীচে ১ থেকে ০, দশমিকের এই দশটি সংখ্যার বাইনারি সংখ্যা কত হবে তা দেওয়া হল।

দশমিক	বাইনারি
০	০০০০
১	০০০১
২	০০১০ (এক ঘর বাঁয়ে সরানো হল। ফলে সংখ্যাটি দাঁড়ালো ২+০=২)
৩	০০১১ (বাঁদিকের ১ সমান ২ ও ডানদিকের ১ সমান ১; এই ২+১=৩)
৪	০১০০ (১-কে দুঘর বাঁয়ে সরানো হল। এক ঘর সরালে দুগুণ বাড়ে। দু ঘর সরানোতে চার গুণ বাড়লো এবং সংখ্যাটি হল ৪)
৫	০১০১ (৪+০+১=৫)
৬	০১১০ (৪+২+০=৬)
৭	০১১১ (৪+২+১=৭)
৮	১০০০ (১-কে তিন ঘর বাঁ দিকে সরানো হল। ফলে সংখ্যাটি হল ১×২×২×২=৮)
৯	১০০১ (৮+১=৯)

ওপরে ০ থেকে ৯ পর্যন্ত দশমিকের সংখ্যাগুলিকে বাইনারি পদ্ধতিতে ৪ বিটস ব্যবহার করে লেখা হয়েছে। ৪ বিটস ব্যবহার করে সবচেয়ে বড় যে দশমিক সংখ্যা লেখা যায় তা হচ্ছে ১৫। দশমিকের ১৫ সমান বাইনারির ১১১১।

যতটা সহজ করে বাইনারি পদ্ধতি বোঝাবার চেষ্টা করা হল, হয়ত পড়ে সবাই তত সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে নাও পারেন! কিন্তু কমপিউটার খুব দ্রুত এবং নির্ভুল-ভাবে এই বাইনারি সংখ্যার গণনা বুঝে নেয়। বাইনারির একটি সংখ্যাকে বুঝতে কমপিউটারের সময় লাগে মাইক্রো-সেকেণ্ডস। আমাদের কাছে যা জটিল, কমপিউটারের কাছে তা খুবই সহজ।

এই বাইনারি পদ্ধতিতেই কমপিউটার অক্ষর নিয়ে কাজ করে। এমনক

প্রতিটি অক্ষরের একটি করে বাইনারি কোড নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যেমন, অধিকাংশ ব্যক্তিগত কমপিউটারে 'A' সমান ০১০০০০০১। অর্থাৎ, কমপিউটারের মালিক যখন কি-বোর্ডের 'A' চিহ্নিত কি-টি টিপলেন, কমপিউটার জানলো ০১০০০০০১। কমপিউটার বাইনারি ডিজিটস-এর ১ বোঝে যখন ভেতরে বৈদ্যুতিক স্পন্দন (পালস) প্রবাহিত হয়। আর, ০ বোঝে 'নো পালস' হলে অর্থাৎ, কোন বৈদ্যুতিক স্পন্দন প্রবাহিত না হলে। সুতরাং, কমপিউটারের মালিক A চিহ্নিত কি টেপার সঙ্গে সঙ্গে কমপিউটারের ভেতরে পর্যায়ক্রমে নো পালস—পালস—নো পালস—নো পালস—নো পালস—নো পালস—নো পালস—পালস প্রবাহিত হল।

ওপরে 'A' সমান যে বাইনারি সংখ্যা দেওয়া হয়েছে তা 'A'-র বাইনারি কোড। অনেক ধরণের কোড ব্যবহার হয় কমপিউটারের কাজে। কোড-এর ভিন্ন ধরণ হয় বিটস ব্যবহারের তারতম্যের ওপর। সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত কোড-এর নাম, 'এক্সটেণ্ডেড বাইনারি কোডেড ডেসিমাল ইণ্টারচেঞ্জ কোড', সংক্ষেপে EBCDIC। কমপিউটারের জগতে যে কোন বর্ণ বা অক্ষর, সংখ্যা বা যতিচিহ্নকে বলে 'ক্যারেকটার'। EBCDIC কোডে প্রতিটি ক্যারেকটার লেখা হয় ৮ বিটস দিয়ে। নীচে এর কয়েকটা নমুনা উদাহরণ হিসাবে দেওয়া হল।

ক্যারেকটার	EBCDIC
০	১১১১০০০০
১	১১১১১০০১
A	১১০০০০০১
a	১০০০০০০১
Z	১১১০১০০১
z	১০১০১০০১
+	০১০০১১১০
=	০১১১১১১০
?	০১১০১১১১

অধিকাংশ আমেরিকান কমপিউটারে যে ৭ বিটস-এর কোড ব্যবহার করা হয় তার নাম, 'আমেরিকান ষ্ট্যাণ্ডার্ড কোড ফর ইনফরমেশন এক্সচেঞ্জ', সংক্ষেপে ASCII।
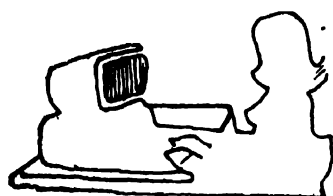
কমপিউটারের ভাষা

মানুষের মত কমপিউটার কথা বলতে পারে না। মানুষের কথাও সে বোঝে না। কিন্তু যিনি কমপিউটার ব্যবহার করবেন, তিনি কমপিউটারকে দিয়ে কি কাজ করাতে চান, তা তো কমপিউটারকে জানাতে হবে! না হলে কমপিউটার কাজ করবে কিভাবে? কমপিউটারের সঙ্গে কাজের কথা বলতে হয় এক ধরণের সংকেতের মাধ্যমে যাকে বলে 'কোড'। এক এক ধরণের কমপিউটারে বিভিন্ন কাজে এক এক ধরণের কোড ব্যবহার করা হয় যাকে বলে 'হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ' বা 'কমপিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ'। বাংলা, ইংরেজী বা হিন্দী-র মত কমপিউটারের এই ভাষাগুলির সংক্ষিপ্ত নাম ফোর্ট্রান (FORTRAN), পাস্কাল (PASCAL), এসেম্বলি (ASSEMBLY), কোবল (COBOL), এক্সপ্লোর (EXPLOR), পি এল আই (PLI), আর পি জি (RPG), পাইলট (PILOT), লোগো (LOGO) ও বেসিক (BASIC)। কয়েকটি ল্যাঙ্গুয়েজের পুরো নাম পরের পাতায় দেওয়া হল।

COBOL	:	Common Business Orientated Language
BASIC	:	Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code
PLI	:	Programming Language One
FORTRAN	:	FORmula TRANslation
RPG	:	Report Programme Generator

উপরোক্ত বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে ফোর্ট্রান ব্যবহার করা হয় অঙ্ক কষার প্রোগ্রাম করতে। হোম কমপিউটারে প্রোগ্রাম করতে সাধারণত ব্যবহৃত হয় বেসিক ল্যাঙ্গুয়েজ। এই ল্যাঙ্গুয়েজটি সবচেয়ে সোজা। এতে অনেক প্রচলিত ইংরেজি শব্দ ও অঙ্কের চিহ্ন ব্যবহার হয়। বেসিক ল্যাঙ্গুয়েজে কমপিউটারকে কিভাবে নির্দেশ দিতে হয় তার একটা খুব সহজ উদাহরণ এখানে দেওয়া হল।

প্রোগ্রাম করার জন্য বা নির্দেশ দেবার জন্য কমপিউটারকে চালু করার সঙ্গে সঙ্গেই কমপিউটার স্ক্রীনে 'রেডি' শব্দটি আলোক লেখায় ফুটে উঠবে। এর অর্থ কমপিউটার নির্দেশ নেবার জন্য তৈরি। এবার কমপিউটারের কি বোর্ডে আপনি ধরুন ইংরেজিতে টাইপ করলেন,

১০ প্রিন্ট "আই এম ইওর ফ্রেণ্ড"

২০ প্রিন্ট "হোম কমপিউটার"

৩০ এণ্ড।

প্রতিটি লাইন টাইপ করার পর কি বোর্ডের 'এণ্টার' (enter) শব্দের কি-টি চেপে কমপিউটারকে টাইপ করা লাইনটি গ্রহণ করতে বলতে হবে। ব্যাস, প্রোগ্রাম করা হয়ে গেল। এবার দেখা যাক এই প্রোগ্রাম পেয়ে আপনার কমপিউটার কি কাজ করবে। এটা জানার জন্য আপনি কমপিউটারের কি-বোর্ডে 'রান' শব্দটি টাইপ করুন। তারপর এণ্টার শব্দের কি-টি চেপে দিন। এবার কমপিউটার স্ক্রীনে তাকিয়ে দেখুন নীচে দেওয়া লেখাটি ফুটে উঠেছে।

আই এম ইওর ফ্রেণ্ড

হোম কমপিউটার

এবার বলি প্রত্যেক লাইনের আগে প্রোগ্রাম করার সময় একটা করে সংখ্যা কেন ব্যবহার করা হয়েছিল। আসলে এই সংখ্যাগুলি লাইনগুলিকে চিহ্নিত করে যা প্রোগ্রামার বা নির্দেশককে পরবর্তী কাজে সাহায্য করে। যদি কোন প্রোগ্রামার আগের কোন একটা লাইন টাইপ করতে ভুলে যান তাহলে সেই লাইনের নম্বর দিয়ে লাইনটিকে পরে টাইপ করে দিলে, কমপিউটার লাইনটিকে ঠিক জায়গায় বসিয়ে নেবে। 'প্রিণ্ট' টাইপ করে কমপিউটারকে নির্দেশ দেওয়া হয়, লাইনটি কমপিউটারের তথ্য ভাণ্ডারে বা স্মৃতিতে ভরে নিতে। 'এণ্ড' টাইপ করে কমপিউটারকে বোঝানো হয় প্রোগ্রাম এখানেই শেষ। 'রান' শব্দটি টাইপ করলে কমপিউটার বোঝে প্রোগ্রাম অনুযায়ী এবার কাজ করতে হবে।
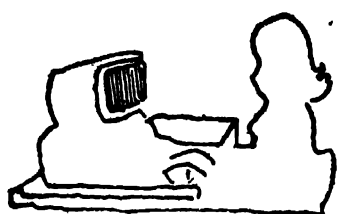
কমপিউটার প্রোগ্রাম

সহজই হোক বা জটিল, মানুষের নির্দেশ না পেলে কমপিউটার কোন কাজ করতে পারে না। কারণ, কমপিউটার আসলে তো একটা যন্ত্র। সুতরাং যে কোন কাজ করাতে হলে নির্দেশ দিতেই হবে। কাজ করানোর জন্য কমপিউটারকে যে নির্দেশ দেওয়া হয় তাকে বলে 'প্রোগ্রাম'। এই প্রোগ্রাম যে তৈরি করে তাকে বলে 'প্রোগ্রামার'। একটি কাজের জন্য সব সময় একাধিক নির্দেশ দেবার প্রয়োজন। প্রোগ্রাম বললে, সঠিক অর্থে, কোন কাজের জন্য কমপিউটারকে দেওয়া নির্দেশ সমূহকে বোঝায়।

আমরা যখন কাউকে দিয়ে কোন কাজ করাই তখনো কিন্তু প্রোগ্রাম করি। উদাহরণ হিসেবে বলি, ধরা যাক বন্ধুর কাছ থেকে নিজের বইটা ফেরত নিতে হবে। আমি বন্ধুকে বললাম, 'ওহে, কাল আমার বইটা অবশ্যই ফেরত দিয়ে যেও।' বন্ধুকে এটা অনুরোধ করা হলেও, আসলে এটা এক ধরণের নির্দেশ দেওয়া এবং

এক কথায় এই নির্দেশ বন্ধুর বোঝার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু কমপিউটার এই নির্দেশ পেলে কাজ করতে পারবে না। কমপিউটারকে দিয়ে এই কাজ করাতে হলে, অর্থাৎ বন্ধুর বাড়ি থেকে আমার বইটা আনতে হলে কমপিউটারকে জানাতে হবে বন্ধুর নাম, বন্ধুর বাড়ি যাবার নির্দেশ, বইয়ের নাম, বই বাড়ির কোন ঘরের কোন র‍্যাকে আছে এবং তা খুঁজে বের করার নির্দেশ, বইটা পেলে নিয়ে বাড়ি ফেরার নির্দেশ এবং সবশেষে বাড়ি ফিরে বইটাকে কোথায় রেখে কাজ শেষ করতে হবে তার নির্দেশ। এই নির্দেশসমূহ পড়ার পর অনেকেরই মনে হবে, কমপিউটারকে দিয়ে সহজ কাজ করানোও খুব জটিল ব্যাপার। হ্যাঁ, কাজ করানো জটিল না হলেও, কোন কাজের জন্য প্রোগ্রাম তৈরি করা নিঃসন্দেহে কিছুটা জটিল কাজ। এর জন্য দরকার বিশেষ প্রশিক্ষণ পাওয়া কুশলী প্রোগ্রামার। প্রোগ্রাম তৈরি করা বা 'রাইটিং এ প্রোগ্রাম' সময় সাপেক্ষও বটে।

প্রোগ্রাম তৈরি করা ও তৈরি করা প্রোগ্রাম নিয়ে কমপিউটারে কাজ করা, দুটো কিন্তু এক নয়। তৈরি করা প্রোগ্রাম নিয়ে কাজ করা খুবই সহজ। সাধারণত আগে থেকে তৈরি করা প্রোগ্রাম দিয়েই কমপিউটার প্রোগ্রামিং করা হয়। ভিডিও গেমসের কার্টিজ অথবা অন্যান্য কাজের জন্য বাজার থেকে অধিকাংশ সময় যে ডিস্ক বা ক্যাসেট কিনে ব্যবহার করা হয়, তা আসলে তৈরি করা প্রোগ্রাম। কমপিউটারে এই কার্টিজ বা ডিস্ক বা ক্যাসেট ভরে কমপিউটার চালু করলেই প্রোগ্রামিং হয়ে যায়। কিন্তু কার্টিজ বা ডিস্ক ভরে কমপিউটার চালু করার পর কমপিউটার 'প্রোগ্রামড' হতে এক এক ক্ষেত্রে এক এক সময় লাগে। টেপ ক্যাসেটে লাগে প্রায় পাঁচ মিনিট। ডিস্কে একটু কম সময় লাগে। কিন্তু একই প্রোগ্রাম ফ্লপি ডিস্কের সাহায্যে করবে এক মিনিটেরও কম সময়ে। ভিডিও গেমসের কার্টিজ যেহেতু 'মেমরি চিপ' দিয়ে তৈরি হয়, সেজন্য এক্ষেত্রে কোন সময়ই লাগে না। তাৎক্ষণিক প্রোগ্রাম হয়ে যায়। এই সময়ের হেরফের হওয়ার কারণ ডিস্ক বা কার্টিজ বা টেপ থেকে প্রোগ্রাম কমপিউটার মেমরিতে যেতে এক এক ক্ষেত্রে এক এক সময় নেয়।

কোন কাজের জন্য কমপিউটার প্রোগ্রাম বানাতে হলে আগে সেই কাজের একটি 'ফ্লো চার্ট' তৈরি করে নিতে হয়। ফ্লো চার্ট তৈরির জন্য প্রথমে কাজটিকে বিভিন্ন ধাপে (ষ্টেপস) ভাগ করে নিতে হবে। ধাপগুলি যুক্ত থাকবে পরপর। প্রতিটি ধাপ কমপিউটারকে বোঝাবে সেই ধাপে কি ধরণের গণনার কাজ করতে হবে কমপিউটারকে। এই ধাপগুলির মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ধাপ থাকে। এই

ধাপে কমপিউটার ব্যবহারকারীর কাছে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। কমপিউটার যে প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করুক না কেন, তার উত্তর হ্যাঁ (ইয়েস) বা না (নো), এই দুটি শব্দ দিয়ে দিতে হয়। ধাপগুলি নির্দিষ্ট করার জন্য তাদের চিহ্নিত করতে হয় সংখ্যা দিয়ে, যাকে বলে 'মেশিন কোড'। একাজে নির্দেশক বা প্রোগ্রামারকে সাহায্য করে 'হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ' বা 'প্রোগ্রাম ল্যাঙ্গুয়েজ' বা 'কমপিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ' যাকে আমরা বাংলায় বলতে পারি কমপিউটারের ভাষা। কমপিউটার ল্যাঙ্গুয়েজে প্রোগ্রাম করে কমপিউটারে ভরে দিলে যে যন্ত্রাংশ তা মেশিন কোডে রূপান্তরিত করে তাকে বলে 'মাষ্টার প্রোগ্রাম' বা 'দি কমপ্লায়ার'।

কমপিউটার প্রোগ্রাম তৈরির সময় কোন ভুল থেকে গেলে বা কোন ভুল নির্দেশ দিলে তাকে বলা হয় 'বাগ'। সাধারণত কোন কমপিউটার প্রোগ্রাম তৈরি করার পর ব্যবহারের সময় তার ভুলভ্রান্তি ধরা পড়লে পরীক্ষা করে দেখা হয় কোথায় ভুল আছে। একে বলে 'ডি বাগিং'।

কমপিউটার দিয়ে কোন কাজ করতে হলে বা কোন সমস্যার সমাধান করতে গেলে প্রোগ্রাম করতে হবে কমপিউটার ল্যাঙ্গুয়েজে। কিন্তু তার আগে আর একটি কাজ থাকে যা না করলে ঠিকমত প্রোগ্রাম করা যায় না। এই কাজকে বলে 'প্রোব্লেম এ্যানালিসিস'। প্রোব্লেম এ্যানালিসিস বা সমস্যা অথবা কাজের বিশ্লেষণ করার জন্য পরপর কয়েকটি ধাপে কাজটি এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। ধাপগুলি নীচে দেওয়া হল।

(১) কি কাজ কমপিউটারকে দিয়ে করাতে হবে তা সুনিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করা বা যে সমস্যার সমাধান করাতে হবে তা যথাযথ উপলব্ধি করা।

(২) কাজ করানোর বা সমস্যা সমাধানের সঠিক পদ্ধতি বেছে নেওয়া বা উদ্ভাবন করা।

(৩) এবার এই পদ্ধতিকে কমপিউটারের বোধগম্য ভাষায় বিস্তারিত ভাবে ধাপে ধাপে ভাগ করে নেওয়া যাকে কমপিউটার জগতে বলে 'সলিউশন এ্যালগরিদম'।

(৪) এই ধাপ অনুযায়ী প্রোগ্রাম লেখা এবং প্রোগ্রামকে যাচাই করে তার ভুলভ্রান্তি দূর করা। -

(৫) 'সলিউশন এ্যালগরিদম' ঠিক মডেলের হয়েছে কিনা তা যাচাই করা।
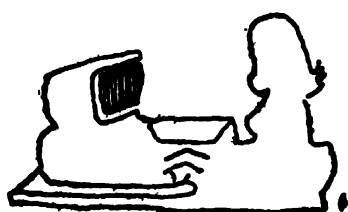
কমপিউটার প্রজন্ম

প্রথম যথার্থ কমপিউটার কোনটি এ নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। অনেকে মনে করেন ১৯৪৪-এ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তৈরি কমপিউটার 'মার্ক-১' প্রথম কমপিউটার। এরপর চল্লিশের দশকের শেষদিকে তৈরি হয় 'ইনিয়াক' ও 'এডস্যাক'। ধীরে ধীরে কমপিউটার প্রযুক্তির উন্নতি হয় এবং উন্নত মানের কমপিউটার 'ইউনিভ্যাক', 'আই বি এম ৩৬০', 'সি ডি সি ৭৬০০', 'আই সি এল ২৯০০' ও আরো অনেক নতুন মডেল তৈরি করা শুরু হয়।

কমপিউটারকে শ্রেণী বিভাগ করা হয় এর তৈরির কারিগরী ও গঠন শৈলী দেখে। এক একটি শ্রেণীকে বলা হয় 'জেনারেশন' বা প্রজন্ম। ইনিয়াক ও এডস্যাক-এর মত ভ্যাকুয়াম টিউব দিয়ে তৈরি কমপিউটারগুলিই হচ্ছে প্রথম প্রজন্মের কমপিউটার। ইনিয়াক-এ ছিল ১৮০০০ ভাল্ব এবং এর ওজন ছিল প্রায় ৩০ টন। ভ্যাকুয়াম টিউব বা ভাল্ব দিয়ে তৈরি কমপিউটারগুলি এর আগের

যান্ত্রিক কমপিউটারের চেয়ে উন্নত হলেও এদের ব্যবহারে অনেক অসুবিধা হতো। ওজন ছিল বেশি, সহজে স্থানান্তরিত করা যেত না, বসাতে জায়গা লাগতো প্রায় ১০০ বর্গমিটার, বিদ্যুৎ খরচ হতো প্রচুর এবং টিউবগুলি গরম হয়ে মাঝে মাঝেই কমপিউটারকে অকেজো করে দিত। আর, একবার অকেজো হলে সারাতে সময় নিত অনেক।

ভ্যাকুয়াম টিউবের বদলে সলিড স্টেট ট্রানজিসটর ব্যবহার করে পঞ্চাশের দশকের প্রথমে দ্বিতীয় প্রজন্মের কমপিউটার তৈরি হয়। ট্রানজিসটর শব্দটি 'ট্রান্সফার রেজিস্ট্যান্স' কথাটির সংক্ষিপ্ত রূপ। ১৯৫১-তে তৈরি হয়েছিল প্রথম 'স্টোরড প্রোগ্রাম কমপিউটার' 'ইউনিভ্যাক'। ট্রানজিসটর ব্যবহার করার ফলে কমপিউটারের আকৃতি আরো ছোট হল, খরচ কমলো তৈরি করার এবং কাজের মানও উন্নত হল।

ষাটের দশকে তৃতীয় প্রজন্মের কমপিউটারে শুরু হল 'ইন্টিগ্রেটেড সারকিট' ব্যবহার। এই ইন্টিগ্রেটেড সারকিট তৈরি করা হতো এক বর্গইঞ্চির একের আট ভাগ আকৃতির একটি সিলিকন চিপ-এর ওপর। ইন্টিগ্রেটেড সারকিট ব্যবহার শুরুর পর থেকে কমপিউটারের চেহারা ক্রমশ আরো ছোট হতে আরম্ভ করে। এই চিপ ব্যবহারের ফলে কমপিউটারের দামও বেশ কমে যায় এবং কাজের ক্ষমতা ও গতি অবিশ্বাস্য রকম বাড়ে। সিলিকন চিপে এই ক্ষুদ্র ইন্টিগ্রেটেড সারকিটকেই পরিভাষায় বলে 'মাইক্রোচিপ'।

চতুর্থ প্রজন্মের কমপিউটারের বিশেষত্ব হচ্ছে এদের ক্ষুদ্র আকৃতি এবং দ্রুত কার্যক্ষমতা। এতে ব্যবহার করা হচ্ছে 'ভেরি লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেটেড সারকিট' (VLSI)। আগামী দশকে তৈরি হবে পঞ্চম প্রজন্মের কমপিউটার যা মানুষের কথা বুঝতে পারবে, যুক্তি প্রয়োগ করতে পারবে প্রয়োজনে এবং এর স্মৃতিতে থাকবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় তথ্য, নিজেই প্রয়োজনে সিদ্ধান্ত নিয়ে কমপিউটার যেগুলি ব্যবহার করবে। পঞ্চম প্রজন্মের কমপিউটার তৈরির কাজে জাপান এখন অনেক এগিয়ে গেছে।

প্রথম প্রজন্মের কমপিউটার বসতো সারা ঘর জুড়ে। আর, এখন পকেট কমপিউটারও বেরিয়ে গেছে। জাপানে তৈরি এই কমপিউটারের দাম মাত্র হাজার খানেক টাকা। সত্তর দশকের শুরুতে কমপিউটারের সেণ্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিটে 'মাইক্রো প্রসেসর' ব্যবহারের শুরুই কমপিউটার তৈরিতে ও গঠনশৈলীতে বিপ্লব নিয়ে এসেছে। একটি মাইক্রো প্রসেসর যা আসলে একটি ক্ষুদ্র সিলিকন

চিপ, এক ঘর যন্ত্রপাতির কাজ করতে পারে। এরকম একটি মাইক্রো প্রসেসর বানাতে খরচ পড়ে মাত্র কয়েক পয়সা।

অনেক সময় আমরা বইপত্রে বা কাগজে 'মেন ফ্রেম' কমপিউটারের কথা পড়ে থাকি। মেন ফ্রেম কমপিউটার আসলে কি? মেন ফ্রেম কমপিউটার বলতে বোঝায় খুব বড়, জটিল ও দামী কমপিউটারগুলিকে। একটি মেন ফ্রেম কমপিউটারে অনেকগুলি ইনপুট ও আউটপুট অংশ থাকে। এছাড়া টেলিফোন লাইন ও উপগ্রহ মারফত সংযোগ থাকে অন্যান্য বড় কমপিউটার, ডাটা ব্যাংক ও অসংখ্য টার্মিনালের সঙ্গে। 'মেন ফ্রেম কমপিউটার সাধারণত মহাকাশযান নিয়ন্ত্রণ বা আবহাওয়া অনুসন্ধানের মত বড় বড় কাজে ব্যবহৃত হয়। এ ধরণের কমপিউটারে একাধিক কাজ একসঙ্গে অনেক লোক বসে করতে পারে।'

মেন ফ্রেম কমপিউটারের চেয়ে ছোট কমপিউটারগুলিকে বলে 'মিনি কমপিউটার'। এদের 'বিজনেস কমপিউটার'-ও বলা হয় যেহেতু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি এ ধরণের কমপিউটার ব্যবহার করে। বিজনেস কমপিউটার এক সঙ্গে একাধিক কাজ করতে পারে না। মিনি কমপিউটারের চেয়ে ছোট ও কম দামী কমপিউটারগুলিকে বলে 'মাইক্রো কমপিউটার' যার বাজারে চালু নাম 'হোম কমপিউটার' বা 'পার্সোনাল কমপিউটার'। মাইক্রো কমপিউটার মিনি কমপিউটারের চেয়ে অনেক কম শক্তিশালী। অনেকে ছোট হোম কমপিউটার কেনেন শুধু ভিডিও গেমস খেলার জন্য। পার্সোনাল কমপিউটারকে অনেকে বলেন 'ইউজার ফ্রেণ্ডলি'। এগুলি ব্যবহার করা খুবই সহজ।

কমপিউটার প্রযুক্তিবিদরা বর্তমানে দু ধরনের কমপিউটার তৈরি নিয়ে খুবই ব্যস্ত। এগুলি হচ্ছে সুপার-সুপার কমপিউটার ও মিনি-মাইক্রো-কমপিউটার। এছাড়া নিবিড় গবেষণা চলছে কমপিউটারের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা 'আরটিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্সি' বা সংক্ষেপে 'এ আই' তৈরির যা কমপিউটারকে দেবে ভাবনা-চিন্তা করার ও প্যারালাল প্রসেসিং-এর ক্ষমতা। আমাদের মস্তিষ্কে প্রায় বারো হাজার কোটি স্নায়ুতন্তু (নিউরন) তারজালির মত ছড়িয়ে আছে। তার-জালিতে আছে কয়েক লক্ষ সংযোগ। এ কারণে মানুষের মস্তিষ্ক সর্বাধুনিক কমপিউটারের চেয়ে অনেক বেশি বহুমুখী। কমপিউটার প্রযুক্তিবিদরা চেষ্টা করছেন নব্বই দশক শুরুর আগে এমন কমপিউটার তৈরি করতে যা মানুষের মস্তিষ্কের চেয়েও বহুমুখী হবে। এজন্য প্রযুক্তিবিদরা কমপিউটার তৈরিতে জৈব পদার্থ ব্যবহারের কথাও ভাবছেন। যেসব জৈব পদার্থ কমপিউটার তৈরিতে ব্যবহার

হবে তাদের বলা হয় 'অর্গানিক ইলেকট্রনিক কম্পোনেণ্টস' বা জৈব ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ। ইতিমধ্যে এরকম একটি যন্ত্রাংশ আবিষ্কার হয়ে গেছে যার নাম দেওয়া হয়েছে 'MED' বা 'মলিকুলার ইলেকট্রনিক ডিভাইসেস'।

পঞ্চম প্রজন্মের কমপিউটারে এই জৈব পদার্থ ব্যবহারের গুরুত্ব এত বেশী কারণ, এই প্রজন্মের কমপিউটারে থাকবে বুদ্ধি। এদের নাম হবে 'KIPS' বা 'নলেজ ইনফরমেশন প্রসেসিং সিস্টেমস'। এজন্য আধুনিক কমপিউটারে যে শক্তিশালী ইন্টিগ্রেটেড সারকিট ব্যবহার হয় তার থেকে কমপক্ষে একশ গুণ বেশি ঘনত্ব সম্পন্ন ইন্টিগ্রেটেড সারকিট দরকার। এজন্য একটা ক্ষুদ্র মাইক্রোচিপে কমপক্ষে এক কোটি ট্রানজিসটর থাকতে হবে। কিন্তু এধরণের মাইক্রোচিপ তৈরি করায় ঝামেলা আছে। সর্ট সার্কিট হবার সম্ভাবনা থাকে। 'KIPS' সম্বলিত সুপার কমপিউটার ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গেছে।

কমপিউটার কি ভাবতে পারে? প্রযুক্তিবিদরা বলেন, হ্যাঁ, পারে। তবে সবরকম ভাবনা নয়। যা ভাবতে তাকে শেখানো হয়, তাই পারে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পেলে কি এই ভাবনার ক্ষমতা বা যুক্তি দিয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হবার ক্ষমতা বাড়বে? কমপিউটারের মধ্যে কি মানুষের মানসিকতা ও অন্য নৈর্ব্যক্তিক অনুভূতিগুলি ঢোকানো সম্ভব হবে?

পঞ্চম প্রজন্মের কমপিউটার নিয়ে গবেষণা যত নিবিড় হচ্ছে, গবেষকদের মনে এসব প্রশ্নগুলি তত বেশি উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। তর্ক বিতর্কও হচ্ছে জোর। আসুন, আমরা সবাই অপেক্ষায় থাকি। দেখা যাক, কি হয়। মানুষের তৈরি যন্ত্র বুদ্ধিমত্তায় মানুষকে ছাড়িয়ে যেতে পারে কিনা? এক্ষেত্রে শুধু একটা বিষয় স্মরণ রাখা দরকার। বিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের বর্তমান বুদ্ধি ও স্বাতন্ত্র্যতায় উন্নিত হতে লেগেছে আন্দাজ দেড় কোটি বছর। আর, কমপিউটারের গণনার ক্ষমতা মাত্র পঁচিশ বছরে বেড়েছে এক কোটি গুণ।
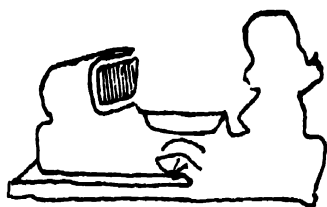
সুপার কমপিউটার

আজকাল সুপার-এর যুগ। সুপার ম্যান, সুপার উওম্যান, সুপার ফাইটার, আরো কত কি? সুপার অর্থে অসাধারণ। নাম শুনেই বোঝা যায় সুপার কমপিউটারও এক ধরণের কমপিউটার। সিনেমার সুপার ম্যান যেমন সাধারণ মানুষের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী এবং চোখের পলকে এমন সব দুরূহ কাজ করে ফেলে যা সাধারণ মানুষের কল্পনারও বাইরে, বাস্তবের সুপার কমপিউটার অনেকটা সেরকমই। সাধারণ কমপিউটারের চেয়ে সুপার কমপিউটার কাজ করে অনেক দ্রুত এবং নিখুঁতভাবে। কাজের গতির হিসাব ধরলে দেখা যায়, সুপার কমপিউটার সাধারণ কম পউটারের চেয়ে, কম করে এক হাজার, এবং, সবচেয়ে বেশি, দশ কোটি গুণ দ্রুত কাজ করতে পারে। বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন, এই শতাব্দীর শেষে এমন সুপার কমপিউটার তৈরি করা সম্ভব হবে য কাজ করবে প্রায় আলোর সমান গতিতে। অন্যভাবে বলা যায়, এই গতি হবে

যে কোন ইলেকট্রনিক সংকেতের দ্রুততম গতির সমান। অঙ্ক কষার বিচার করলে, সুপার কমপিউটারগুলি প্রতি সেকেণ্ডে ষাট লক্ষ থেকে এবশো কুড়ি কোটি অঙ্ক করতে পারে।

এখন দেখা যাক এত দ্রুত কাজ সুপার কমপিউটার করে কি করে। সাধারণ কমপিউটারে প্রসেসরগুলি একটা নির্দিষ্টক্রমে পরপর সাজানো থাকে; একে বলে 'সিকোয়েন্সিয়াল প্রসেসরস'। সুপার কমপিউটারের বেলায় এই প্রসেসর সাজাবার ক্রমপর্যায়টি হয় সমান্তরাল, অর্থাৎ, 'প্যারালাল প্রসেসরস'। সুপার কমপিউটারে সাধারণ কমপিউটারের মত 'মেমরি সার্কিট' থাকে না। তার বদলে থাকে 'লজিক সার্কিট' যা কমপিউটারে ভরা তথ্যগুলিকে বিশ্লেষণ করে ও সাজিয়ে রাখে। সমান্তরাল ক্রমপর্যায়ে সাজানো অসংখ্য প্রসেসর দিয়ে তৈরি সুপার কমপিউটার যখন কাজ করে, প্রথমে সমাধানের জন্য দেওয়া বিশেষ দায়িত্ব বা সমস্যা বা কাজটিকে (প্রব্লেম) টুকরো টুকরো করে ভাগ করে নেয়। এবার এক একটি প্রসেসর এক একটি টুকরো নিয়ে কাজ করে। সব প্রসেসরের ফলাফল মিলিয়ে পাওয়া যায় চূড়ান্ত ফল। তথ্য বিশ্লেষণের জন্য সুপার কমপিউটার 'ভেক্টর প্রসেসিং' এবং 'প্যারালাল প্রসেসিং' পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে। এই দুই প্রসেসিং বা বিশ্লেষণ পদ্ধতির সুবিধা অনেক যা সাধারণ কমপিউটারে নেই। ভেক্টর প্রসেসিং-এর ফলে একই সঙ্গে অনেক ধরণের এবং প্রতিটি ধরণের অসংখ্য তথ্য একসাথে বিশ্লেষণ করা যায়। প্যারালাল প্রসেসিং এই কাজকে সম্পন্ন করে সমান্তরাল গতিতে। অর্থাৎ, সুপার কমপিউটারের কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। এরকম প্যারালাল প্রসেসিং মানুষের মস্তিষ্কতেও ঘটে। কাজ দ্রুত করার জন্য সুপার কমপিউটারে সিলিকন চিপস-এর বদলে গ্যালিয়াম আরসেনাইড দিয়ে তৈরি চিপস ব্যবহার করা হয়। এই নতুন ধরণের চিপস ছগুণ দ্রুত কাজ করে, গরম হয় না, আলো বিকীরণ করে ও আকৃতিতেও ছোট হয়।

সুপার কমপিউটারের মস্তিষ্ক সাধারণ কমপিউটারের চেয়ে অনেক অনেক বেশি শক্তিশালী। এক একটি সুপার কমপিউটারে যে কোন বিশাল সাধারণ গ্রন্থাগারের সমস্ত বইয়ে ছাপা তথ্যকে সংরক্ষণ করা যায়। সুপার কমপিউটার যে শুধু তথ্য বিশ্লেষণ করে তাই নয়, জ্ঞান বিশ্লেষণও করে থাকে (নলেজ প্রসেসিং)। এজন্য সুপার কমপিউটারে আছে 'নলেজ ইনফরমেশন প্রসেসিং সিস্টেমস'। ইংরেজীতে একে সংক্ষেপে বলে 'KIPS'। এই নলেজ প্রসেসিং-এর কাজ হয় যুক্ত

ও বিযুক্ত প্রক্রিয়ায়। সুপার কমপিউটার চালাতে যে কমপিউটার ভাষা ব্যবহার করা হয় তার নাম 'LISP' 'লিষ্ট প্রসেসিং' এবং 'PROLOG' বা 'প্রোগ্রামিং ইন লজিক'।

১৯৫০-এ কমপিউটার প্রযুক্তিবিদরা প্রথম সুপার কমপিউটার তৈরির কাজে হাত দেন। সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনেই এই প্রচেষ্টার শুরু। গোপন সংকেত উদ্ধার, জটিল অস্ত্রশস্ত্রের নকশা তৈরির জন্য জন ভন নিউম্যানের গাণিতিক সূত্র ব্যবহার করে বানানো এই সুপার কমপিউটার ছিল অপেক্ষাকৃত শ্লথগতি সম্পন্ন। প্রথম আধুনিক সুপার কমপিউটার তৈরি হয় ১৯৭০-এ। আমেরিকায় তৈরি এই কমপিউটারের নাম ছিল ইলিয়াক-৪। প্রায় ৫০ এম ফ্লপস (Mflops) গতিতে এই সুপার কমপিউটারটি কাজ করতো। এমফ্লপস বা মেগাফ্লপস বলতে বোঝায়, 'মিলিয়ন ফ্লোটিং পয়েন্ট অপারেশনস পার সেকেণ্ড।' সুপার কমপিউটারের সাধারণ কাজের গতি মাপার একক এটি। আজকালকার সুপার কমপিউটারের কাজের গতি মাপার একককে বলে 'জি ফ্লপস' (Gflops) বা 'গিগা ফ্লপস'। এক গিগা ফ্লপস সমান এক 'বিলিয়ন অপারেশনস পার সেকেণ্ড।'

ইলিয়াকের দু বছর পর যে সুপার কমপিউটারটি তৈরি হয় তার নাম 'কণ্ট্রোল ডাটা ষ্টার।' এরও ছয় বছর পর তৈরি প্রথম সর্বাধুনিক সুপার কমপিউটার ক্রে-১। সেমুর ক্রে-এর জনক। ১৮০ মেগাফ্লপস গতিতে কাজ করতে পারে ক্রে-১ সমান্তরাল বিশ্লেষণ ক্ষমতার সাহায্যে। ক্রে-১ তৈরি করে সেমুর ক্রে সুপার কমপিউটার তৈরির বিপ্লবের সূচনা করেন। শুরু হয়, কে কত শক্তিশালী সুপার কমপিউটার তৈরি করতে পারে, তার প্রতিযোগিতা। ১৯৮০-তে তৈরি হয় ৪০০ মেগাফ্লপস গতি বিশিষ্ট সাইবার-২০৫ সুপার কমপিউটার। কণ্ট্রোল ডাটা ষ্টার তৈরি করেছিল যে আমেরিকান কোম্পানী, ক্রে-১ কে টেক্কা দিতে তারাই এটা বানায়। কিন্তু হার মানার পাত্র নন সেমুর ক্রে। ১৯৮২-তে ঘোষণা করলেন ক্রে-এক্স এম পি/২ বানানোর কথা যা ৪৮০ মেগাফ্লপস গতিতে কাজ করতে সক্ষম। এরপর ১৯৮৫-তে ক্রে ঘোষণা করেছেন আধুনিক কমপিউটার প্রযুক্তির চরম বিস্ময় ক্রে-২ তৈরির পরিকল্পনা। ক্রে-২তে থাকবে দু লক্ষ চল্লিশ হাজার চিপস। দেখতে হবে অর্ধ গোলাকৃত গরম জলে স্নান করার টবের মত। কুড়ি মিলিয়ন ডলার বা প্রায় পঁচিশ কোটি টাকা দামের এই সুপার কমপিউটার ১২০০ মেগাফ্লপস গতিতে কাজ করতে পারবে।

এত দ্রুত গতিতে কাজ করার জন্য যে পরিমান তাপ কমপিউটারের ভেতরে উৎপন্ন হবে তাতে সার্কিট গলে যাবার সম্ভাবনা আছে। সেজন্য ক্রে-২ শুধু ঠাণ্ডা ঘরে বসালেই হবে না। এই সুপার কমপিউটারের ভেতরে রেফ্রিজারেটারের গ্যাস পাইপের মাধ্যমে গ্যাস প্রবাহ রাখবে ঠাণ্ডা করার বিশেষ ব্যবস্থা। ক্রে-২ তৈরির পরিকল্পনা করেই সেমুর ক্রে থেমে থাকেন নি। ইতিমধ্যে ১৯৮৭তে ক্রে-৩ বানাবার কথাও ঘোষণা করেছেন। ক্রে-৩ কাজ করবে ১০ গিগা ফ্লপস গতিবেগে। তরল নাইট্রোজেন ব্যবহার করে এই কমপিউটারকে ঠাণ্ডা রাখা হবে। দাম কত পড়বে তা সেমুর ক্রে এখনো বলতে পারেন নি।

১৯৮১ পর্যন্ত সুপার কমপিউটার তৈরির ব্যাপারে এই অসাধারণ প্রতিভাবান কমপিউটার প্রযুক্তিবিদ সেমুর ক্রে তাঁর দেশ আমেরিকাকে সর্বেসর্বা করে রেখেছিলেন। ১৯৮২-র জুন মাস নাগাদ জাপান আমেরিকাকে চ্যালেঞ্জ জানালো। জাপানের ফুজিৎসু তৈরি করলো পাঁচশো মেগাফ্লপস গতিবিশিষ্ট প্রথম সুপার কমপিউটার। এর ছমাস পরে হিতাচি শিল্পগোষ্ঠী যে সুপার কমপিউটারটি তৈরি করেছিল তার কাজ করার গতি ছিল ৬৩০ মেগাফ্লপস। এরপর ১৯৮৫-তে জাপানের নিপ্পন ইলেকট্রিক কর্পোরেশন ১৩০০ মেগাফ্লপসের সুপার কমপিউটার বানিয়ে বিশ্বকে অবাক করে দিয়েছে। বর্তমানে সুপার কমপিউটার বানানোর রেষারেষিটা জাপান ও আমেরিকার মধ্যে ভালই জমেছে। জাপান চেষ্টা করছে কত তাড়াতাড়ি সেকেণ্ডে একশো কোটি অঙ্ক করতে পারে এ রকম সুপার কমপিউটার বানানো যায়।

সামরিক বাহিনীর কাজে সাহায্যের জন্য সুপার কমপিউটার বানানোর কাজ শুরু হয়েছিল। এখনো পর্যন্ত সারা পৃথিবী জুড়ে যে দুশোর মত সুপার কমপিউটার কাজ করছে তা প্রধানত সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনেই। সামরিক বাহিনী ছাড়া খনিজ তেল অনুসন্ধান, পারমাণবিক চুল্লির নিয়ন্ত্রণ, দূরসঞ্চার যন্ত্র চালানো, বংশানু প্রযুক্তিবিদ্যা, মহাকাশ চর্চা, আবহাওয়া পর্যালোচনা ও অন্যান্য দুরূহ জটিল গবেষণার কাজেও এই সুপার কমপিউটারকে লাগানো হচ্ছে। মজার ব্যাপার আরো, ভবিষ্যতের সুপার সুপার কমপিউটার তৈরির কাজেও প্রধান সাহায্যকারী হচ্ছে আজকের সুপার কমপিউটারগুলি। আমেরিকার সুপার কমপিউটার তৈরির এক সংস্থা আশা করছেন যে অদূর ভবিষ্যতে তাঁরা এমন সুপার সুপার কমপিউটার তৈরি করবেন যা হবে উড়োজাহাজ পরীক্ষা করার উইণ্ড টানেল, মোটরগাড়ী পরীক্ষা করার টেস্ট ট্র্যাক অথবা রাসায়নিক

পরীক্ষাগার। ভবিষ্যতের এই সুপার সুপার কমপিউটারে থাকবে কয়েক লক্ষ ট্রানজিস্টার যার এক একটির কাজ করবার ক্ষমতা হবে আজকের দশটি সুপার কমপিউটারের যৌথ ক্ষমতার সমান।

সুপার কমপিউটার ব্যবহারের সম্ভাবনা অনেক, সুবিধাও প্রচুর। সেই সঙ্গে এর ব্যবহারে সমস্যা ও ঝামেলাও অনেক। প্রথমত, সুপার কমপিউটারকে কাজে লাগাতে হলে বিভিন্ন ধরনের প্রচুর তথ্য জোগাড় করতে হয়। এই তথ্য হতে হবে নির্ভুল। তারপর প্রয়োজন মত 'প্রোগাম' বা কাজের নির্দেশ তৈরী করে সংগৃহীত তথ্য কমপিউটারে ঢোকানো এক এলাহী কাজ। এছাড়া প্রতিদিনই নতুন নতুন তথ্য তৈরি হচ্ছে। ফলে প্রতিদিনই কমপিউটারে অপ্রয়োজনীয় পুরোনো তথ্য বাতিল করে নতুন তথ্য ঢোকানোর কাজ থাকছেই। এসব কাজের জন্য দরকার প্রচুর অভিজ্ঞকুশলী কমপিউটার প্রোফেশনালস যাদের দীর্ঘদিন ট্রেনিং দিয়ে তৈরি করে নিতে হয়।

এ বই প্রকাশের আগেই হয়ত ভারত আমেরিকা থেকে ক্রে-এক্স এম পি / ২৪ সুপার কমপিউটার কিনে ফেলবে। আবহাওয়া পর্যালোচনা ও আবহাওয়া সম্পর্কে নির্ভুল সংবাদ আগাম জানানোর কাজ করবে এই কমপিউটার। যদি ঠিকমত কাজে লাগানো যায়, তবে ভবিষ্যতে প্রায় সাত থেকে দশদিন আগে আমরা জানতে পারবো, কবে বৃষ্টি হবে বা কবে বরফ পড়বে। দেশের কোথায় কোনদিন তাপমাত্রা হবে কত। ফলে আবহাওয়ার খামখেয়ালীপনার হাত থেকে, আগেই খবর পাওয়ার জন্য বহুক্ষেত্রেই রক্ষা পাবে সাধারণ মানুষ।
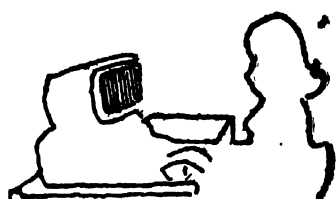
বায়ো কমপিউটার

কমপিউটার বলতে আমাদের ধারণা হল, এটা এক যন্ত্র। ভ্যাকুয়াম টিউব, ট্রানজিস্টার, আই সি, ও আরো অসংখ্য বড় ছোট যন্ত্রাংশ দিয়ে এটি তৈরি। কিন্তু এর মধ্যে কোন প্রাণীদেহ ঢোকানো নেই। বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকলে এই যন্ত্র কাজ করতে পারে না। কমপিউটারের মানুষের মত মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রও নেই। আজকের সর্বাধুনিক কমপিউটারগুলি এখনো প্রকৃত অর্থে যন্ত্র।

কিন্তু আর বেশিদিন বাকি নেই 'বায়ো কমপিউটার' বা 'বায়োলজিকাল কমপিউটার' আবিষ্কৃত হতে! এ কথা বলছেন 'বায়ো টেকনলজি' নিয়ে গবেষণা করেন যে বিজ্ঞানীরা। এ ধরণের কমপিউটারে যে 'সেনসর' থাকবে তা তৈরি হবে জৈব পদার্থ দিয়ে এবং কাজ করবে প্রাণীদেহের কোষ সংকোচন ও প্রসারণ পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে। জৈব প্রযুক্তিবিদ্যার গবেষণায় বর্তমানে যে অগ্রগতি হয়েছে তা কাজে লাগিয়েই ইতিমধ্যে এ ধরণের 'বায়ো-সেনসর' তৈরির

অণুর নকশা বানানো সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে 'ব্যাকটেরিও রোডোপ্সিন' নামে এমন এক ধরণের ব্যাকটিরিয়া আবিষ্কার করেছেন যা আলোর সংস্পর্শে এলে আলোক শক্তিকে বিদ্যুৎ-রসায়ন শক্তিতে বা ইলেকট্রো-কেমিকাল এনার্জিতে পরিবর্তন করে। এই ব্যাকটেরিও রোডোপ্সিনে কোন ছবির প্রতিফলন হলে তাও ধরে রাখতে পারে। লেসার প্রযুক্তি ব্যাকটেরিও রোডোপ্সিনে ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা এখন কমপিউটারের তথ্য ভাণ্ডার বা কমপিউটার ষ্টোরের মত ষ্টোর বানাবার চেষ্টায় ব্যস্ত।

আধুনিক কমপিউটারগুলি ডিজিটাল কমপিউটার। বায়ো কমপিউটার কিন্তু হবে এ্যানালগ কমপিউটার। আজ পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ ধরণের জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া বিজ্ঞানীরা সনাক্ত করতে সমর্থ হয়েছেন যা বায়ো কমপিউটার তৈরির কাজে লাগবে। রাশিয়া, আমেরিকা ও জাপান—এই তিনটি দেশের মধ্যে বায়ো কমপিউটার তৈরির গবেষণায় বর্তমানে রাশিয়ার অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য। যদি অদূর ভবিষ্যতে সত্যিই বায়ো কমপিউটার তৈরি সম্ভব হয়, তবে তা হবে বিজ্ঞানের আর এক বিস্ময়কর চমক।
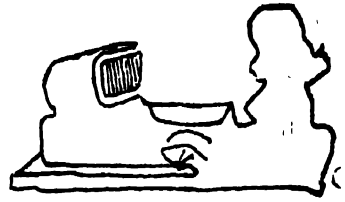
কৃষিকাজে কমপিউটার

কৃষি বিশেষজ্ঞদের ধারণা আগামী শতকে 'ইলেকট্রনিক ফার্মিং' পুরোদমে চালু হয়ে যাবে। আর, এর পেছনে মূল ভূমিকা পালন করবে কমপিউটার। ইতিমধ্যেই বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতে চাষবাস সংক্রান্ত বহু কাজ কমপিউটার করতে শুরু করে দিয়েছে। যেমন গ্লাস হাউসে তৈরি সবজি বা ফুল বাগানে সেচ দেওয়া, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ও বায়ু চলাচলের কাজ কমপিউটারের মাধ্যমে হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে রিমোট কন্ট্রোল পদ্ধতিতে ট্রাক্টরের মধ্যে বসানো কমপিউটারকে নির্দেশ দিয়ে জমি চাষ করা যাবে। ফসলের ক্ষেতে বসানো মাইক্রোচিপস মাটিতে জলের অবস্থা নির্ণয় করে কমপিউটারকে জানিয়ে দেবে এবং কমপিউটার অবস্থা বুঝে হয় সেচের পাম্পের সুইচ অন করবে অথবা খুলে দেবে জল নিকাশনের নালার গেট। এখন ইনস্যাট ১-এ উপগ্রহ মহাকাশ থেকে ছবি তুলে কমপিউটারের মাধ্যমে জানিয়ে দিচ্ছে কবে বৃষ্টি হবে বা কবে বরফ

পড়বে ? আগামী শতাব্দীর শুরুতে এ ধরণের বেশ কয়েকটি উপগ্রহ দূর মহাকাশ থেকে ফসলের প্রতিটি ক্ষেতের ওপর নজর রাখবে এবং ক্ষেতে ফসলের অবস্থার তথ্য সরাসরি পাঠিয়ে দেবে কৃষকের নিজস্ব কমপিউটারে। এই একটি কমপিউটার আবার কৃষকের চাষবাস সংক্রান্ত কাজের হিসেব নিকেশও করবে। কোন রোগ বা পোকা দমনে কোন ওষুধ কখন কত পরিমাণে দিতে হবে বা কোন ফসলে কোন সার মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে কতটা দিতে হবে, কমপিউটারের বোতাম টিপলে এখনই কৃষক জানতে পারছেন।

কৃষকদের সুবিধার জন্য ব্রিটেন আমেরিকার মত ধনী দেশগুলির কৃষি দপ্তর বসিয়েছে একটি মেন ফ্রেম কমপিউটার। এতে ভরা আছে চাষবাস সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সব তথ্য। প্রত্যেক কৃষকের নিজস্ব হোম কমপিউটার টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে সংযুক্ত করা যায় কৃষি দপ্তরের কমপিউটারের সঙ্গে। ফলে, দিনে বা রাতে যে কোন সময় কৃষক তার প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নিতে পারেন ঘরে বসে। এছাড়া হোম কমপিউটারের সাহায্যে কৃষক চাষের উপকরণ কেনা, উৎপাদিত ফসল বিক্রি এবং ব্যাংকের সাথে লেনদেন ও আরো অনেক কাজই করতে পারছেন। ফলে কৃষকের সময় বাঁচছে, খরচ কমছে, ফসলের চাষ হচ্ছে সঠিক সময়ে ও পদ্ধতিতে এবং কৃষি উৎপাদন বাড়ছে অনেক গুণ।
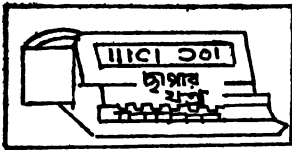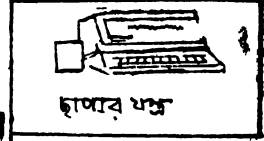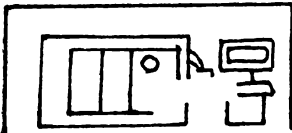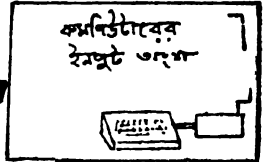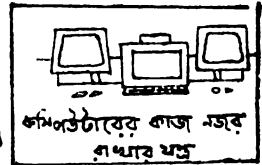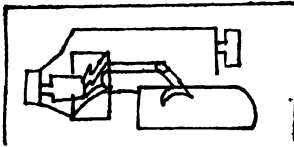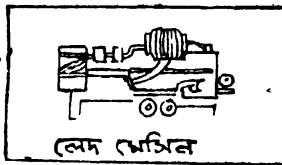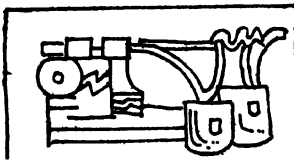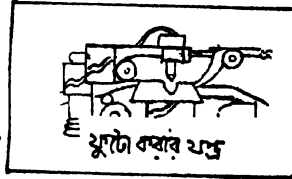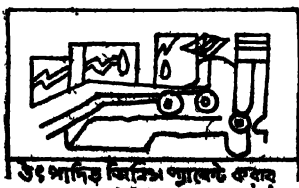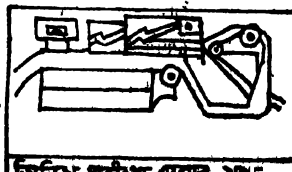
ছাপার যন্ত্র
ছাপার যন্ত্র
ছাপার যন্ত্র
কম্পিউটারের ইনপুট অংশ
পরিসংখ্যান সংগ্রহ যন্ত্র
কারখানার
কম্পিউটার
তথ্য ভরার বাড়তি ব্যবস্থা
কম্পিউটারের কাজ নজর রাখার যন্ত্র
ঢালাই যন্ত্র
লেদ মেশিন
রং করার যন্ত্র
ফুটো করার যন্ত্র
উৎপাদিত জিনিস প্যাকেট করার
জিনিস পরীক্ষা করার
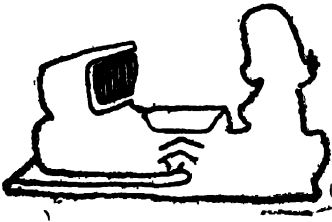
শিল্পোৎপাদনে কমপিউটার

বিভিন্ন শিল্পের কলে কারখানায় কমপিউটারের দু রকম ব্যবহার হয়। প্রথমত, কমপিউটার চালিত যান্ত্রিক হাত বা রোবট ব্যবহার। আর, দ্বিতীয় ব্যবহারে কারখানার বিভিন্ন মেশিনের সঙ্গে একটি কমপিউটারকে যুক্ত করে দেওয়া হয়। এর জন্য বিভিন্ন মেশিনের মধ্যে, কোন মেশিনকে কিভাবে চালাতে হবে, তার প্রোগ্রাম করা থাকে কমপিউটারে। কমপিউটার সেই প্রোগ্রাম অনুযায়ী মেশিনগুলিকে চালায়। কোন মেশিনের পর কোন মেশিনকে চালাতে হবে তার পরম্পরাও কমপিউটারকে জানানো থাকে। পণ্য উৎপাদনের মেশিনগুলি চালানো ছাড়াও, কমপিউটার কত জিনিস তৈরি হল, কাঁচামাল কোনটা কি পরিমাণ খরচ হয়েছে তার হিসেব রাখে। এই হিসেব আবার জানিয়ে দেয় কোম্পানীর সদর দপ্তরে বসানো কমপিউটারে সঙ্গে সঙ্গে।

শিল্পো ৎপাদনে কমপিউটার ব্যবহার উৎপাদন বাড়িয়েছে, উৎপাদিত পণ্যের

মান উন্নয়ন করেছে, উৎপাদন খরচ কমিয়েছে। যেসব কারখানা কমপিউটার নিয়ন্ত্রিত, সেই কারখানায় কাজকর্ম চালানোও সহজ। কারণ, শ্রমিক লাগে কম এবং শ্রমিকরা ফাঁকি দিতে পারে না। কমপিউটার পাহারাদারের কাজ করে। স্ট্রাইক বা লকআউটও হয় না।

আজকাল বহু শিল্পের উৎপাদিত পণ্যের গায়ে 'বার কোড' ছাপা থাকে। বিদেশে ছাপা বইয়ের কভার বা খাবারের প্যাকেট বা কোকোকোলার ক্যানে লক্ষ্য করলে এক জায়গায় দেখবেন পাশাপাশি কতগুলি সরু মোটা লাইন ও তার তলায় কতগুলি সংখ্যা ছাপা আছে। আমার আপনার কাছে হয়ত ওই দাগগুলির কোনও মূল্য নেই! কিন্তু যে প্রস্তুত-কারক বা বিক্রেতা, তার কাছে এই 'বার কোড' প্রয়োজনীয়। কারণ, বার কোডে থাকে পণ্যের বিষয়ে অনেক তথ্য যা বিক্রী বা গুদামজাত করার সময় হিসেব রাখতে সুবিধা হয়। বার কোডের ওপর দিয়ে কমপিউটারের সাথে লাগানো লেজার পেন একবার দাগ দিলে, কমপিউটার সঙ্গে সঙ্গে ওই জিনিষটির বিশদ বিবরণ নথিভুক্ত করে নেয়।

বারকোড

সম্প্রতি জার্মানীর হাইডেলবার্গে কমপিউটার চালিত এমন ছাপাখানার যন্ত্র তৈরি হয়েছে যার কালার স্ক্যানারের সাহায্যে কমপিউটার বুঝে নিতে পারে বহু বর্ণের কোনও ছাপায় রঙ ঠিকমত গাঢ় হয়ে পড়ছে কিনা। ঠিক না হলে, কমপিউটারই সব ঠিক করে দেয়। এভাবেই কমপিউটার আসার পর অন্য অনেক শিল্পের মত মুদ্রণ শিল্পেও নীরব বিপ্লব ঘটে গেছে। আর, মুদ্রণ শিল্পের মত আরও অনেক শিল্পের গ্রাহক পরিসেবার কাজ কমপিউটার বসানোতে অনেক উন্নত হয়েছে।
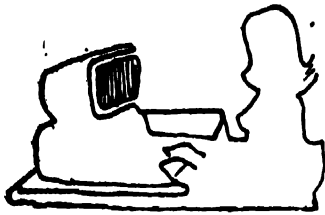
রোবট

এক কথায় 'রোবট' হচ্ছে কমপিউটার চালিত যন্ত্র। রোবট শব্দটির উৎপত্তি চেক ভাষা থেকে যার অর্থ 'ক্রীতদাস' বা 'শ্রমিক'। ১৯২১-এ লেখা চেক লেখক কারেল কাপেক-এর নাটক 'রুসামস ইউনিভার্সাল রোবটস' (R-U-R) থেকে রোবট শব্দটি গ্রহণ করা হয়।

ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় রোবট ব্যবহারের কথা প্রথম গ্রীকদের মাথায় এসেছিল। গ্রীক ধাতুশ্রমিক ও শিল্পকারিগরদের দেবতা হেফাএষ্টাস প্রথম দুটি মেয়ে রোবট তৈরি করেছিলেন সোনা দিয়ে। বাস্তবে শিল্পবিপ্লব শুরুর পর মাত্র দুশো বছর আগে থেকে যান্ত্রিক রোবট তৈরির কথা আমরা জানতে পারি। রোবট নামের প্রচলন হয়েছে মাত্র অর্ধশতক আগে।

রোবটকে বাংলায় বলে যন্ত্রমানব। রোবট কিন্তু মানুষের মত দেখতে নয়। আসলে একজোড়া যান্ত্রিক হাত বা 'মেকানিকাল আর্ম'। রোবটকে মানুষের মত

দেখতে, এটা রোবট যারা দেখেননি তাদের কল্পনা। আর, এই কল্পনার উৎস হচ্ছে সাহিত্য ও সিনেমা। ১৯৩০-এ ফ্রিজ ল্যাং-এর ছবি 'মেট্রোপলিস'-এ প্রথম মনুষ্যাকৃতি রোবট দেখানো হয়। সাহিত্যে রোবটকে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছেন বোধহয় কল্পবিজ্ঞান লেখক আইজাক আসিমভ। এমনকি আমেরিকার এক রোবট প্রস্তুতকারক সংস্থা এই লেখকের নামকে স্মরণীয় করে রাখতে 'আইজাক' নাম দিয়ে একজোড়া রোবট আর্ম তৈরি করেছে। সাহিত্যে বা সিনেমায় রোবটের চরিত্র সবসময় খারাপই থাকে কারণ তার মালিক হয় কোন পাগলা বিজ্ঞানী বা ক্ষ্যাপা ধনকুবের যে রোবটকে দিয়ে সব খারাপ কাজগুলি করায়। রোবট সম্পর্কে সাধারণের মনে যাতে খারাপ ধারণা না হয় সেজন্য ১৯৪০-এ আসিমভ রোবোটিক্স সংক্রান্ত তিনটি আইন প্রণয়ন করেন। আইন তিনটি নীচে দেওয়া হল।

(১) কোনও রোবট কোনও মানুষকে আঘাত করবে না অথবা, কোনও মানুষকে চোখের সামনে আঘাত পেতে দেখলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে না।

(২) রোবটকে মানুষ যে কাজ করতে হুকুম করবে সে তাই করতে বাধ্য থাকবে যদি না সেই হুকুম প্রথম আইনের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হয়।

(৩) রোবট নিজের অস্তিত্বকে বজায় রাখার জন্য সব সময় প্রচেষ্টা চালাবে যতক্ষণ না এই প্রচেষ্টা প্রথম দুটি আইনের সঙ্গে সংঘাত সৃষ্টি করে।

শুরুতে লিখেছি রোবট হচ্ছে কমপিউটার চালিত যন্ত্র। কিন্তু এটুকু বললে বোধহয় রোবট সম্পর্কে পুরো বলা হয় না। পুরো বোঝাও যায় না। আমেরিকার রোবোটিক্স ইণ্ডাষ্ট্রি এ্যাসোসিয়েশন রোবটকে বলে, "রিপ্রোগ্রামেবল, মাল্টিফাংশন ম্যানিপুলেটারস ডিজাইনড টু মুভ মেটিরিয়াল, পার্টস, টুলস, অর স্পেশালাইজড ডিভাইসেস থ্রু ভেরিয়েবল প্রোগ্রাম মোশনস ফর দি পারফরমেন্স অফ এ ভ্যারাইটি অফ টাস্কস।" অন্যভাবে বললে, রোবট হচ্ছে এক ধরণের যন্ত্র যা নির্দেশ গ্রহণ করতে পারে এবং সেই নির্দেশ অনুসারে কোন মানুষের সাহায্য ছাড়াই একা একা কাজ করতে সক্ষম।

১৯৬৮-তে প্রথম যথার্থ রোবট তৈরি করে ক্যালিফোর্নিয়ার ষ্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়। এই রোবটের নাম দেওয়া হয়েছিল 'সিসি'। এরপর বিগত আঠারো বছরে অসংখ্য রোবট তৈরি হয়েছে। এইসব রোবটের কোনটাই ষ্টার ওয়ার ছবির C-3PO যন্ত্র মানবের মত দেখতে নয়। অধিকাংশ রোবটই হচ্ছে কমপিউটার চালিত যান্ত্রিক হাত যা এক জায়গায় স্থির থেকে জোড়া লাগানো,

রং করা, জিনিসপত্র তোলা এবং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার কাজ করে। ইদানিং সমুদ্রের তলা থেকে জিনিষ তুলতেও রোবট ব্যবহার হচ্ছে। রোবট যে কাজই করে নিখুঁত করে। ক্লান্তিহীন একটানা কাজ করতে এর জুড়ি নেই। অনেক ক্ষেত্রে রোবটকে বিভিন্ন শিল্পের কারখানায় জটিল কাজেও লাগানো হচ্ছে। বিশেষ করে শিল্পক্ষেত্রের সেই সমস্ত কাজে যা করতে গেলে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যহানির বা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকে।

সম্প্রতি ঘরের কাজেও রোবট ব্যবহার শুরু হয়েছে। গত বছর আমেরিকায় বেশ কয়েক হাজার বাড়ীতে কাজে লেগে গেছে রোবট। প্রতিদিনই রোবট-ঝি বা রোবট-চাকরের সংখ্যা বাড়ছে। আমেরিকা থেকে আমদানী করে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতেও রোবটকে ঘরের কাজে লাগানো হচ্ছে। বর্তমানে বেশ কয়েক ধরণের রোবট তৈরি হচ্ছে ঘরের কাজের জন্য। এদের মধ্যে 'টোপো' আর 'হিরো' অল্পদিনেই বেশ বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। টোপো চাকার সাহায্যে সামনে পেছনে চলাফেরা করে। কমপিউটার নিয়ন্ত্রণ করে ওর গতিবিধি। হিরোর কাজকর্মও টোপোর মত। এ ঘর থেকে ও ঘরে জিনিষ রেখে আসা, মাটি থেকে জিনিষ তোলা, কোন জিনিষ খুঁজে বের করা, এসব কাজে দু রোবটই ওস্তাদ। আমেরিকার এক কোম্পানি বাড়ী পাহারা দেবার জন্য তৈরি করেছে এক রোবট যার নাম 'টট'। বাড়ী পাহারা ছাড়াও টট সময় বলতে পারে, ঘর পরিষ্কার করার যন্ত্র ঠেলতে পারে এবং বালতি ভর্তি জিনিষ নিয়ে এঘর থেকে ওঘরে যায়।

রোবট দিয়ে ঘরের কাজ করানোর সুবিধাও যেমন আছে, অসুবিধাও অনেক। সুবিধার মধ্যে একবার কিনলে আর কোন খরচ নেই। জলখাবার, মাসমাইনে ও পুজোর কাপড় চাইবে না। প্রতিদিন চব্বিশঘণ্টা একটানা কাজ করবে। এক কাজের কথা বারবার বলতে হবে না। হাতটানেরও অভ্যাস নেই। অসুবিধার মধ্যে, মানুষের সব কাজ রোবট করতে পারে না। বুদ্ধি খাটিয়ে চিন্তা করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করার ক্ষমতা রোবটের নেই। নির্দেশ বা প্রোগ্রামের বাইরে কোন কাজ এই যন্ত্র করতে পারে না। এমন কি ঘরের মধ্যে চলতে চলতে চাকা পিছলে ভুল পথে চলে গেলে সঠিক পথে ফিরে আসার সময় ঘরের আসবাবপত্রে ধাক্কা খায়। চাকার সাহায্যে গড়িয়ে চলে বলে সিঁড়ি ভেঙে বাড়ির একতলা দোতলা করতে পারে না। রোবট ঝি ও চাকরকে নিয়ে আর এক সমস্যা এরা ভালমন্দের তফাৎ বোঝে না।

কমপিউটার প্রযুক্তির মত রোবট প্রযুক্তিরও অবিশ্বাস্য দ্রুত উন্নতি হচ্ছে। আমেরিকায় এখন এমন রোবট তৈরি হচ্ছে যা মুখের হুকুম শুনেই কাজ করতে পারবে। রোবট ভিশনের সাহায্যে ইদানিং রোবট নাকি দেখতেও পারছে। শোনা সম্ভব হচ্ছে ইলেকট্রনিক কানের জন্য। অনুভব করার ক্ষমতা আছে এমন রোবটও তৈরি আরম্ভ হয়েছে যা ডিম ও পেপারওয়েট অক্লেশে ধরে তুলে কাজ করতে পারবে। কোনটাই ভাঙ্গবে না। শোনা যাচ্ছে শীঘ্রই রোবটকে নাকি মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচারের কাজেও লাগানো হবে! রোবট প্রযুক্তির কত উন্নতি হয়েছে তা বোঝার জন্য আমেরিকার জেনারেল মোটর কোম্পানির নতুন কারখানার কথা বলি যার শতকরা নব্বই জন শ্রমিক হচ্ছে রোবট। জাপানে কারখানায় কাজ করে যেসব রোবট তাদের বলে 'বাটন বস।' যন্ত্রের বোতাম টিপে রোবট সব কাজ করায় বলে রোবটকে এই নাম দেওয়া হয়েছে।

কাজের জন্য রোবট ছাড়াও আজকাল বিদেশের বাজারে বাচ্চাদের খেলার জন্য রোবট ইঁদুর, রোবট কচ্ছপ প্রভৃতি পাওয়া যাচ্ছে। ইংল্যাণ্ডে আজকাল গোলক ধাঁধার মধ্যে রোবট ইঁদুরের দৌড় প্রতিযোগিতাও হচ্ছে। রোবট টেবিল টেনিস প্লেয়ার তৈরিরও চেষ্টা চলছে যে প্র্যাকটিসের ভাল সঙ্গী হবে।
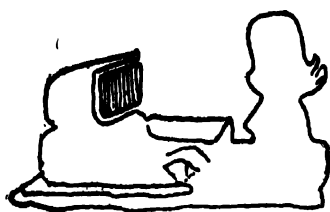
ব্যাংকে কমপিউটার

উন্নত দেশগুলিতে ব্যাংকের কাজকর্মে কমপিউটার ব্যবহার বহুদিন আগেই চালু হয়ে গেছে। ওসব দেশে এখন সম্পূর্ণ কমপিউটারাইজড ব্যাংকিং। আজ কেউ যদি বার্কলে বা লয়েডস ব্যাংকের লণ্ডনের কোনও একটি শাখায় একাউন্ট খোলেন, চেক বইয়ের সঙ্গে একটি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক কার্ড ও গোপন সাংকেতিক সংখ্যা পাবেন। ব্যাংক খোলা থাকলে চেক দিয়ে টাকা তোলা যাবে। আবার ব্যাংকের ইলেকট্রনিক কাউণ্টারে কার্ড ও সাংকেতিক সংখ্যা ব্যবহার করে সপ্তাহের যে কোনও দিন সকাল সাতটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত, ওই ব্যাংকের সারা গ্রেট ব্রিটেনে ছড়িয়ে থাকা যে কোনও শাখা থেকে এ্যাকাউণ্টের মালিক টাকা তুলতে পারবেন।

ইলেকট্রনিক কাউণ্টার থেকে টাকা তোলার অভিজ্ঞতা বেশ মজার। এজন্য চেক লেখার দরকার নেই। পাশবই তো ওদেশের ব্যাংক দেয়ই না। যার

টাকা তোলার দরকার, যে ব্যাংকে এ্যাকাউন্ট আছে, সেই ব্যাংকের যে কোন শাখার ইলেকট্রনিক কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে কাউন্টারের ফুটো দিয়ে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক কার্ডটা ঢুকিয়ে দিলেন। ইলেকট্রনিক কাউন্টারগুলি দেখতে অনেকটা টাইপমেশিনের কি-বোর্ডের মত যার সঙ্গে একটা ছোট্ট ভিডিও ডিসপ্লে ইউনিট আছে। কাউন্টারটা থাকে ব্যাঙ্কের বাড়ির রাস্তার ফুটপাথের সঙ্গে লাগোয়া দেওয়ালে।

ইলেকট্রোম্যাগনেটিক কার্ড ফুটো দিয়ে ঢোকানোর সঙ্গে সঙ্গে কাউন্টারের কাচের ঢাকনা খুলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ভিডিও ডিসপ্লে ইউনিটে লেখার মাধ্যমে কমপিউটার নির্দেশ দেয় গোপন সাংকেতিক নম্বর জানানোর জন্য। কি-বোর্ডের কি টিপে সাংকেতিক নম্বর জানালে কমপিউটার প্রথমে জানায় এ্যাকাউন্টে কত টাকা আছে। তারপর নির্দেশ দেয় কত টাকা তোলার দরকার তা জানাতে। কি বোর্ড মারফত এটা জানার পর প্রথমে ফুটো দিয়ে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক কার্ডটা বেরিয়ে আসে। কার্ডের পর অন্য একটি ফুটো দিয়ে টাকা বের হয়। যদি এ্যাকাউন্ট হোল্ডার যে পরিমাণ টাকা তুলতে চান সেই টাকা তার এ্যাকাউন্টে না থাকে, তবে কমপিউটার তাকে টাকা দেবার বদলে ভিডিও ডিসপ্লে ইউনিট মারফত নির্দেশ দেয় ব্যাংকের ক্যাশিয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করার।

কমপিউটারাইজড ব্যাংকিং-এ প্রায় সব কাজই কমপিউটার করে। কোনও ব্যাংকের মাষ্টার লেজার হচ্ছে, ওই ব্যাংকের প্রধান কমপিউটারটি। ব্রাঞ্চ লেজার হচ্ছে, ব্রাঞ্চের কমপিউটারগুলি। এই ব্রাঞ্চ লেজার ও মাষ্টার লেজার সবসময় তথ্য আদান প্রদান করে। ফলে ব্যাংকের হিসেব নিকেশের কাজ কখনোই বাকি পড়ে না। কমপিউটার মাসের শেষে প্রতিটি এ্যাকাউন্টের ষ্টেটমেণ্ট ছেপে বের করে দেয় যা ডাক মারফত চলে যায় এ্যাকাউন্টের মালিকের কাছে।

সম্প্রতি আমাদের দেশের ব্যাংকেও কমপিউটার বসতে শুরু করেছে। ব্যাংকে কমপিউটার বসানো আর, কমপিউটারাইজড ব্যাংকিং সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। ব্যাংকে একটা কমপিউটার বসালে হিসাব নিকাশ ও ক্লিয়ারিং কাজগুলি তাড়াতাড়ি হবে। কিন্তু উন্নত দেশের ব্যাংকের মত কার্ড দিয়ে টাকা তোলা যাবে না। তবে ব্যাংকে এই কমপিউটার বসানোকে কমপিউটারাইজড ব্যাংকিং-এর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ধরা যেতে পারে।

ব্যাংকে কমপিউটার বসানোর পর ব্যাংকগুলি গ্রাহকদের ম্যাগনেটিক ইঙ্ক দিয়ে ছাপা এক নতুন ধরণের চেক দিতে শুরু করেছেন। এই চেকগুলির তলায় চেকের নম্বর এক বিশেষ ধরণের হরফে ছাপা থাকে। ব্যাংকের কমপিউটারে এই চেকটি ঢোকালে কমপিউটার ডকুমেণ্ট রিডারের সাহায্যে চেক নাম্বারটি পড়ে নেয়। এ ধরণের চেক ব্যাংক ভাঁজ করতে না বলে। কারণ, ভাঁজ করলে ডকুমেণ্ট রিডারের পড়তে অসুবিধা হয়। চেকে যে নম্বর ছাপা থাকে তা শুধু চেক নম্বরই নয়। ওই নম্বরের মধ্যে লুকিয়ে থাকে ব্যাংকের নাম, শাখার নাম এবং কোন শহরে ওই শাখাটি অবস্থিত তার নাম। ফলে ক্লিয়ারিং হাউসের কমপিউটারে এই চেক ঢোকালে কমপিউটারের পক্ষে লক্ষ লক্ষ চেককে শহর,

NATIONALBANK

John Doe
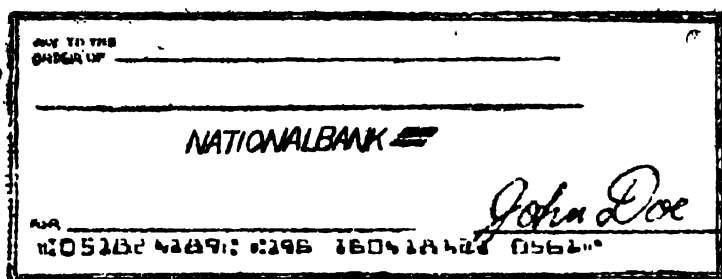
ম্যাগনেটিক ইংকে ছাপা চেক

ব্যাংক ও শাখা অনুসারে বাছতে সুবিধা হয়। চেকে ম্যাগনেটিক ইঙ্ক ব্যবহারের এই পদ্ধতিকে বলে, 'ম্যাগনেটিক ইঙ্ক কোডিং ডিভাইস' (MIC)।

ম্যাগনেটিক ইঙ্ক কোডিং ডিভাইস ছাড়াও ভারতীয় ব্যাংকগুলিতে লেজারে তথ্য লেখার জন্য ছোট ছোট মাইক্রোপ্রসেসর ব্যবহার শুরু হয়েছে। এই মাইক্রোপ্রসেসার ব্যবহার সেভিংস এ্যাকাউণ্ট ও কারেণ্ট এ্যাকাউণ্টের গ্রাহকদের দ্রুত পরিসেবায় সাহায্য করবে। এ ছাড়া দেশের প্রতিটি ব্যাংকের রিজিওনাল ও জোনাল সেণ্টারগুলির দপ্তরে মিনি কমপিউটার বসানো হবে শীগগিরি। এই মিনি কমপিউটার সব ধরণের তথ্য ও পরিসংখ্যান রাখতে সাহায্য করবে।

পরবর্তী পর্যায়ে প্রতিটি ব্যাংকের প্রধান দপ্তরে বসবে মেন ফ্রেম কমপিউটার। এই মেন ফ্রেম কমপিউটার বসানোর পর রিজিওনাল, জোনাল ও ব্রাঞ্চ অফিসের কমপিউটারগুলি যুক্ত করা হবে এবং আমাদের দেশে কমপিউটারাইজড ব্যাংকিং চালু হবে।

ব্যাংকে কমপিউটার চালু হলে ক্লিয়ারিং-এর কাজ হবে খুব দ্রুত। যে চেক ক্লিয়ার হতে লাগে চার দিন তা একদিনেই হয়ে যাবে। দিল্লীর ব্যাংকের চেক কলকাতার ব্যাংকে জমা দিলে তিন দিনেই ক্যাশ হয়ে যাবে। এছাড়া ব্যাংকে জালিয়াতিও কমবে অনেক।
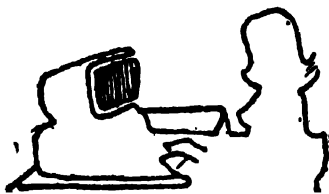
চালক যখন কমপিউটার

ড্রাইভার নেই, গাড়ি চলছে। মোড় নিচ্ছে ঠিক রাস্তার বাঁকে। থামছে ট্রাফিক লাইটের রক্তচক্ষু দেখলে। সবুজ হলে চলছে আবার। চলতে শুরু করলে গাড়ির দরজা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। পাশে কোন গাড়ি এলে সরে যাচ্ছে গা বাঁচিয়ে। আচমকা ব্রেক কষছে সামনে কিছু পড়লে। যে জায়গায় যাবার কথা, পৌঁছে, গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে নিজের থেকে। দরকার হলে মাঝ রাস্তায় রেডিও টেলিফোনে খবর পেয়ে গন্তব্যস্থলে না গিয়ে ফিরে আসছে গাড়ি।

এরকম একটা গাড়ি হলে দারুণ সুবিধা! নয় কি? ড্রাইভার রাখার খরচ লাগবে না। আবার, নিজেকেও সময় খরচ করে বা কষ্ট করে চালাতে হবে না। কোথাও যাবার সময় গাড়িতে চেপে ডিজিটাল কন্ট্রোলের রিমোট সুইচ টিপে ইঞ্জিনটা চালু করে দিলেই হল। তারপর, বই পড়তে পড়তে বা জানলা দিয়ে দুপাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাওয়া।

আগামী দিনের কমপিউটার চালিত মোটরগাড়ি ঠিক এরকমই হবে। দূর ভ্রমণে কমপিউটার প্রথম ব্যবহার হয় মহাকাশ যানে। তারপর উড়োজাহাজ চালানোতে কমপিউটারের সাহায্য নেওয়া আরম্ভ হয়েছিল। তবে মহাকাশযান বা উড়োজাহাজে কমপিউটার ব্যবহার হয় চালককে সাহায্য করার জন্য। সর্ব-প্রথম চালকবিহীন গাড়ি হিসেবে ফ্রান্সে ট্রেন চালানো শুরু হয় কমপিউটার দিয়ে। আর, কমপিউটার দিয়ে মোটরগাড়ি চালানোর চেষ্টায় সাফল্য এখন প্রায় হাতের মুঠোয় এসে গেছে! পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির নামী দামী সব গাড়ির কারখানায় গোপনে চূড়ান্ত রূপ দেবার চেষ্টা চলছে এ ধরণের গাড়ির। দেখার বিষয়, কোন কোম্পানী আগে বাজারে ছাড়ে কমপিউটার চালিত মোটরগাড়ি।

মোটরগাড়ির চালক যখন কমপিউটার হবে, এই কমপিউটারের নির্দেশেই গাড়ি চলবে, থামবে। ডাইনে বাঁয়ে ঘুরবে গাড়ির ষ্টিয়ারিং। উইণ্ডগ্লাসে জল পড়লে চালু হবে ওয়াইপার। অন্ধকার হলে জ্বলে উঠবে হেডলাইট। গাড়ির ইলেকট্রনিক একসেলারেটর সরাসরি যুক্ত থাকবে এই কমপিউটারের সঙ্গে। তেল, জল বা ব্যাটারির চার্জ ফুরিয়ে যাবার আগে, কমপিউটার স্ক্রীনে সতর্কীকরণ দেখা যাবে। গাড়ির কোন যন্ত্রাংশ কিরকম কাজ করছে তাও জানাবে কমপিউটার। মোট কথা স্বয়ংক্রিয় মোটরগাড়ির প্রাণকেন্দ্র হবে এই কমপিউটার এবং গাড়ি চালানোর প্রায় সব কাজই করবে। কমপিউটারকে কাজে সাহায্য করার জন্য থাকবে একটি রাডার ও একটি ইলেকট্রনিক সেনসর। গাড়ি চলার সময় রাডার কমপিউটারকে জানাবে চারপাশে কি আছে। এছাড়া রাস্তার খানাখন্দ বা হাম্প ইত্যাদির সম্পর্কেও রাডার সাবধান করে দেবে। ইলেকট্রনিক সেনসর ড্রাইভারের পাশের আয়নার কাজ করবে। আলোর তেজ কমে এলে লাইট জ্বালানো বা পেছনের গাড়ীর আলোর সংকেত দেখে বা হর্ন শুনে পাশে সরে যাওয়া, এসব কাজে কমপিউটারকে সাহায্য করবে এই সেনসর। ট্রাফিক লাইটের রঙ দেখে গাড়িকে থামানো বা চালানোর কাজেও সাহায্য করবে সেনসর। এক কথায় রাডার ও সেনসর হবে স্বয়ংক্রিয় গাড়ির চোখ ও কান। এছাড়া গাড়ির রেডিও টেলিফোনের সঙ্গেও কমপিউটারের যোগ থাকবে যার দ্বারা গাড়ির মালিক বাড়িতে বসে টেলিফোন করে চলন্ত গাড়ির কমপিউটারকে নির্দেশ দিয়ে কাজ করাতে পারবেন।

কোন রাস্তা দিয়ে গাড়িকে কতদূর যেতে হবে এবং গন্তব্যস্থল সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ না পেলে কিন্তু কমপিউটার গাড়ি চালাতে পারবে না। সুতরাং কোন জায়গায় যাবার আগে, রাস্তার নির্দেশ কমপিউটারে ভরে দিতে হবে। নির্দেশে

থাকবে, গাড়ি চলতে শুরু করার পর কত কিলোমিটার সোজা যাবে, তারপর কোন্‌দিকে ঘুরবে, আবার কতটা যাবার পর আবার কোনদিকে ঘুরে যাবে··· । এই নির্দেশ দেবার জন্য দুটি জিনিস খুবই জরুরী। যেসব রাস্তা দিয়ে গাড়ি যাবে তার একটি নিখুঁত নকশা, আর প্রতিটি রাস্তার সঠিক দূরত্বের মাপ। কমপিউটারে ছবি আঁকার পদ্ধতি অনুসরণ করে নকশাটি কমপিউটারের মেমরি বা স্মৃতিতে ঢুকিয়ে দিতে হবে। এই সঙ্গে দূরত্বও জানাতে হবে।

রাস্তার নকশা ও দূরত্বের পরিমাপ নিখুঁত হওয়া ছাড়াও, স্বয়ংক্রিয় মোটরগাড়ি চলার জন্য রাস্তাঘাট হতে হবে ছবির মত। সব রাস্তাই হবে একমুখী। রাস্তা যত কম আঁকা বাঁকা হয় ততই ভাল। বাঁকের মুখগুলিকে করতে হবে চওড়া। রাস্তা সব সময় রাখতে হবে পরিষ্কার ঝকঝকে। রাস্তায় নোংরা পড়ে থাকলে গাড়ির রাডার ভাববে সামনে কিছু পড়েছে। গাড়ি ব্রেক কষে থেমে যাবে। একই কারণে, রাস্তার দু পাশের ফুটপাথ ছেড়ে যেখানে খুশী রাস্তায় নেমে হাঁটা চলবে না। এছাড়া প্রতিটি রাস্তার দুপাশের বাড়িঘর, পার্ক, লেক, সবেরই উল্লেখ থাকতে হবে শহরের নকশায়। সবদিক বিচার করলে, কমপিউটার চালিত মোটরগাড়ি ভাল চলবে আধুনিক পরিকল্পনায় তৈরি শহরগুলিতে। ইচ্ছে হলে এ ধরণের গাড়ির কমপিউটারকে সাময়িক অকেজো করে রেখে গাড়ির মালিক আজকের গাড়ির মতই ওই গাড়িকে চালাতে পারবেন।

যে পদ্ধতিতে কমপিউটার মোটরগাড়ি চালাবে, সেই পদ্ধতিতেই চালাবে ট্রাক, বাস, টেম্পো, জিপ। ট্রেন চালানো কমপিউটারের পক্ষে আরো সোজা। ট্রেন শহরের রাস্তায় ডাইনে-বাঁয়ের গোলকধাঁধার মধ্য দিয়ে চলে না। এক লাইন দিয়েই চলে। সেজন্য কমপিউটারে শুধু বিভিন্ন ষ্টেশনের মধ্যে দূরত্ব ভরে দিয়ে থামা-চলার প্রোগ্রাম করে দিলেই হয়।

এরকম মনে হতে পারে কমপিউটার চালক হলে বোধ হয় কোন দুর্ঘটনা হবে না! কারণ, কমপিউটার সব সময় নির্ভুল কাজ করে। এ প্রসঙ্গে নীল আর্মষ্ট্রংয়ের চাঁদে নামার ঘটনাটা বলি। মূল মহাকাশযান থেকে চাঁদের ভেলায় চড়ে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের সময় কমপিউটার চাঁদের ভেলাকে চাঁদের যে স্থানে নামাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সেখানে নামলে চাঁদের ভেলা দুর্ঘটনায় পড়তো। এটা আগে থেকে বুঝতে পেরে মহাকাশচারীরা কমপিউটারের সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করে নিজেরাই অবতরণের স্থান ঠিক করেন। অনেক বিজ্ঞানীর ধারণা কমপিউটারের এই ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণ কমপিউটার চন্দ্রপৃষ্ঠ সংক্রান্ত সব তথ্য জানতো না।
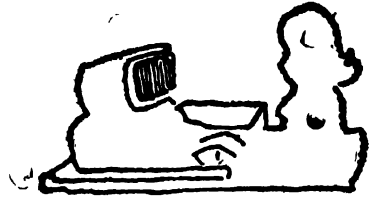
যুদ্ধের প্রয়োজনে কমপিউটার

প্রথম কমপিউটার তৈরির প্রচেষ্টার অন্যতম প্রেরণা ছিল যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করা। এখনো পৃথিবীর অধিকাংশ বৃহৎ সর্বাধুনিক কমপিউটারগুলিকে মানুষ যুদ্ধের প্রয়োজনেই ব্যবহার করছে। কমপিউটার না থাকলে হাইড্রোজেন বোমা তৈরি আজও সম্ভব হতো না। আমেরিকা ও রাশিয়ার সমস্ত রাডার ও মিসাইল ব্যবস্থা কমপিউটারের সাথে যুক্ত। অবস্থা এমন পর্যায় পৌঁছেছে, কমপিউটার ছাড়া আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রগুলি কাজই করতে পারবে না। এছাড়া কমপিউটারে শত্রুপক্ষের গতিবিধি ও সমর সম্ভার সংক্রান্ত বিশদ তথ্য ভরে নকল যুদ্ধ বাধিয়ে সবরকম ভবিষ্যত পরিস্থিতি যাচাই করে দেখা হয়। বিভিন্ন যুদ্ধাস্ত্রের কার্যক্ষমতাও পরীক্ষা করা হয় এভাবে। কমপিউটারের ভাষায় একে বলে 'ব্যাটল সিমুলেশন'। কিন্তু এই ব্যাটল সিমুলেশনের ওপর সম্পূর্ণ ভিত্তি করে যদি কোন দেশ যুদ্ধ করতে যায় তবে পরাজয়েরও আশংকা আছে। কারণ গুপ্তচরের

মাধ্যমে পাওয়া শত্রুপক্ষের তথ্যগুলি অনেক সময় সঠিক হয় না। এখন ভুল তথ্য কমপিউটারে ভরলে কমপিউটার কখনোই সঠিক পথ বাতলাতে পারবে না। অনেকে বলেন ভিয়েৎনামের যুদ্ধে আমেরিকার পরাজয়ের অন্যতম কারণ কমপিউটারকে ভুল তথ্য সরাবরাহ।

আজকাল অনেক রাষ্ট্রনেতাই আশংকা করছেন, কমপিউটার গণ্ডগোল করলে একদিন হয়ত মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই পারমাণবিক যুদ্ধ লেগে যেতে পারে। আর, এ যুদ্ধ একবার লাগলে পৃথিবীর ধ্বংস অনিবার্য। এই আশংকা যে একেবারে অমূলক তা কিন্তু নয়। কারণ, পারমাণবিক অস্ত্রধারী সব দেশেই পরমাণু বোমা সম্বলিত মিসাইলগুলিকে কমপিউটারের সাহায্যে ছোঁড়ার ব্যবস্থা করা আছে। কমপিউটারতো একটা যন্ত্র। এটা গণ্ডগোল করতেই পারে, যদিও সে সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তাহলেও দুর্ঘটনার কথা কে বলতে পারে?

কমপিউটার ও পরমাণু যুদ্ধ নিয়ে আর এক ধরণের বিপদেরও আশংকা আছে। পরমাণু মিসাইল ছোঁড়ার জন্য এই অস্ত্রে শক্তিশালী দেশের প্রতিরক্ষা দপ্তরের নিযুক্ত কমপিউটারে নিশ্চয়ই এক বা একাধিক কোড আছে। এখন এই কোড যদি কোনও অর্বাচীন বা পাগল জেনে যায় এবং সে যদি কোনভাবে প্রতিরক্ষা দপ্তরের কমপিউটারকে এই কোডে নির্দেশ দিতে পারে তবে যুদ্ধ বাধতে কতক্ষণ। আর, এক দেশ মিসাইল ছুঁড়লে অন্যদেশ রাডারের মাধ্যমে তা জেনে যাবে এবং এই রাডার মারফত পাওয়া তথ্য দ্বিতীয় দেশের মিসাইল ছোঁড়ার কমপিউটারে গেলেই, কমপিউটার ছুঁড়বে পাল্টা মিসাইল। পুরো ব্যাপারটা ঘটতে হয়ত সময় লাগবে কয়েক সেকেণ্ড।
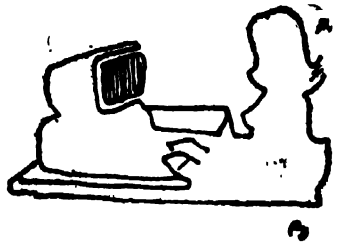
রাজনীতি ও কমপিউটার

রাজনীতিতে কমপিউটার বেশিদিন ঢোকে নি। কমপিউটার সরাসরি রাজনীতি করতেও পারে না। যারা রাজনীতি করেন এবং রাজনৈতিক সংবাদদাতা ও বিশেষজ্ঞরা এই যন্ত্রকে ব্যবহার করেন বিভিন্ন সময়ে নিজেদের কাজের প্রয়োজনে।

রাজনীতিতে কমপিউটার সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় ভোটের সময়। বিভিন্ন তথ্য ও ভোটারদের সাক্ষাৎকার নিয়ে কমপিউটারের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে দেখা হয় কোন দলের বা কোন কোন প্রার্থীর জেতার সম্ভাবনা বেশি। ভোটের আগে এ ধরণের বিশ্লেষণ এবং ফলাফল সম্পর্কে ভবিষ্যতবাণী অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে ভোটারদের মনে দারুণ প্রভাব বিস্তার করে। এজন্য অনেক নির্বাচন প্রার্থীই আজকাল নির্বাচন জেতার জন্য কমপিউটার ব্যবহার করে বিপক্ষের ভোটারদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। ভোটের পরেও

নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণের কাজে কমপিউটার দারুণ পারদর্শী। এই বিশ্লেষিত তথ্যের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলগুলি তাদের ভবিষ্যত কর্মসূচী স্থির করে! বিগত লোকসভার নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার সময় আমরা দূরদর্শনের পর্দায় দেখেছি কমপিউটার ব্যবহার করে কিভাবে নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়। এক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখতে হবে, কমপিউটারের নির্বাচন সংক্রান্ত মতামত কিন্তু সবসময় সত্য হয় না। কমপিউটার কতটা নির্ভুল বিশ্লেষণ করবে তা নির্ভর করে কমপিউটারকে যে তথ্য দেওয়া হচ্ছে তা কতটা বাস্তব তার ওপর।

কমপিউটার প্রযুক্তিবিদদের অনুমান আর কিছুদিনের মধ্যেই ভোটাররা ঘরে বসে নিজস্ব হোম কমপিউটারের সাহায্যেই ভোট দিতে পারবেন। পোলিং বুথে গিয়ে আর লাইন দিতে হবে না। 'ফলস ভোট' দেওয়াও বন্ধ হবে। এটা এমন কিছু কঠিন কাজও নয়। নির্বাচন দপ্তরের মূল কমপিউটারের সঙ্গে টেলিফোন লাইনের সাহায্যে হোম কমপিউটারটি যুক্ত করে নিয়ে তারপর কি-বোর্ডে আঙুল চালিয়ে পছন্দসই প্রার্থীর নাম হোম কমপিউটারকে জানিয়ে ওটা মূল কমপিউটারকে পাঠিয়ে দেবার নির্দেশ দিলেই হবে। কমপিউটারের মাধ্যমে ভবিষ্যতের এই ভোট দেবার পদ্ধতির নাম হবে, 'ইলেকট্রনিক ভোটিং।'
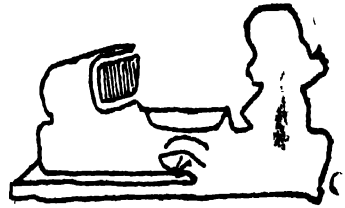
চিকিৎসার কাজে কমপিউটার

চিকিৎসার কাজে কমপিউটারের ব্যবহার যত দিন যাচ্ছে, বাড়ছে। প্রথম দিকে কমপিউটারে সংগ্রহ করা তথ্য থেকে ডাক্তাররা বিভিন্ন রোগের লক্ষণ, চিকিৎসা পদ্ধতি, ওষুধের বিক্রিয়া প্রভৃতি দরকার হলে জেনে নিতেন। আজকাল ডাক্তাররা রুগীর রোগের লক্ষণগুলি কমপিউটারে ঢুকিয়ে দিলে, কমপিউটার বলে দেয় কোন রোগ হয়েছে। রোগ নির্ণয়ে আমেরিকায় যে মেডিকাল কমপিউটার তৈরি করা হয়েছে তার নাম 'ক্যাডিউসিয়াস'। আমেরিকার ডাক্তাররা লক্ষ্য করেছেন, রুগীরা আজকাল ডাক্তারের চেয়ে কমপিউটারকে তাদের রোগ সংক্রান্ত গোপন খবরাখবর বলা বেশি পছন্দ করেন। রুগীর কাছে সব জেনেও যদি নিশ্চিতভাবে রোগ সনাক্ত না করতে পারে, তাহলে মেডিকাল কমপিউটার আবার প্রশ্ন করে। তবে মেডিকাল কমপিউটার কখনোই রোগের সূক্ষ্ম তাৎপর্য-গুলি ধরতে পারে না কারণ, রুগী নিজেই এগুলি বুঝতে পারে না। এজন্য

মেডিকাল কমপিউটার কখনোই মানুষের মত পারদর্শী ডাক্তার হয়ে উঠতে পারবে না।

রোগ নির্ণয় ছাড়া আজকাল এক্স-রে স্ক্যানার দিয়ে তোলা ছবির বিশ্লেষণ করে ফল জানার জন্য কমপিউটার ব্যবহার হচ্ছে। এছাড়া ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতিগুলিও চালাচ্ছে কমপিউটার। এর ফলে রোগীর শারীরিক অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ সম্ভব হচ্ছে। ডাক্তার এবং নার্সদের ওপর চিকিৎসার বিভিন্ন পর্যায়ে মানসিক চাপ কমে যাচ্ছে। এর ফলে তাঁরা চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজগুলি করতে পারছেন সাহসের সঙ্গে এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন নির্ভুল।

কমপিউটার জটিল রোগের চিকিৎসায় মানুষের মত পারদর্শী ডাক্তার না হতে পারলেও, বিজ্ঞানীদের অনুমান এমন একদিন আসবে যখন ঘরে বসেই কমপিউটার ব্যবহার করে রুগীরা নিজের চিকিৎসা নিজেরাই করতে পারবেন। কমপিউটার যদি রোগ নির্ণয় করতে পারে তবে সেই রোগের ওষুধও বলতে পারবে সঙ্গে সঙ্গে। সুতরাং, অসুবিধা কোথায়।
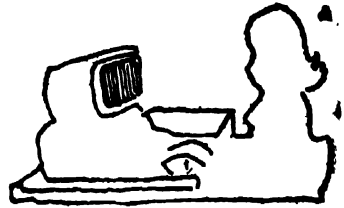
কমপিউটারের নজরদারী

লণ্ডনের এক ফ্ল্যাটে খুন হয়েছেন এক মহিলা। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দারা তদন্ত করে সনাক্ত করে ফেলেছেন খুনী কে? কিন্তু, ধরতে পারছেন না। প্লেনের টিকিট ও রিজার্ভেশন দেখিয়ে খুনী প্রমাণ করে দিয়েছে খুনের দিন সে কানাডায় ছিল। দিশেহারা গোয়েন্দার দল। অকাট্য প্রমাণ জোগাড় করতে হবে যে খুনের দিন ওই সন্দেহভাজন খুনী লণ্ডনেই ছিল। নাহলে খুনীকে ধরা যাবে না, খুনের কিনারাও হবে না। আরো ছড়িয়ে দেওয়া হল তদন্তের জাল। অবশেষে প্রমাণ মিলল। দেখা গেল, খুনের দিন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক কার্ড ব্যবহার করে ব্যাংক থেকে টাকা তুলেছে খুনী। আর, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক কার্ড দিয়ে ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে হলে ব্যক্তিগত গোপন কোড নম্বর ব্যবহার করতে হয় যা অ্যাকাউন্টের মালিক ছাড়া অন্য কেউ জানতে পারে না। ব্যাংকের কমপিউটার থেকে এই তথ্য জানতে পেরে পুলিশ নিশ্চিন্ত হয়ে ধরল খুনীকে।

জেরার সময় খুনী স্বীকার করল, সে কানাডায় যায়নি। নিজের নামে টিকিট কেটে জাল পাশপোর্ট দিয়ে এক ভাড়া করা লোককে কানাডা পাঠিয়েছিল।

এভাবেই কমপিউটারের দৌলতে পশ্চিমের দেশগুলিতে আজকাল ব্যক্তিগত খবরাখবর গোপন রাখা খুবই মুস্কিল হয়ে পড়েছে। মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার টেপে যে কোন ব্যক্তির সারা জীবনের সব তথ্যই ধরে রাখা যায়। আর, একাজ করতে কোন অসুবিধাও নেই। জন্মাবার পর বার্থ রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে কমপিউটারে। স্কুল ও কলেজ জীবনের সব তথ্যই থাকছে কমপিউটারে ভরা, এমন কি লাইব্রেরি থেকে কোন বই নিয়ে পড়াশুনা করেছে তা পর্যন্ত। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত খবরাখবর রাখছে হাসপাতালের কমপিউটার। অফিসের কমপিউটার রাখছে চাকরি জীবনের খুঁটিনাটি। টাকাপয়সার হিসাব রাখছে ব্যাংকের কমপিউটার। এছাড়া ট্রেন বা প্লেনে ভ্রমণের তারিখ, বেশি দাম দিয়ে কেনা জিনিষপত্রের তালিকা ও ব্যক্তিগত টেলিফোনে কার সঙ্গে কবে কখন কথা হয়েছে সব তথ্যই বিভিন্ন কমপিউটার রাখছে। ইচ্ছে করলে পুলিশ বা গোয়েন্দারা সহজেই এইসব কমপিউটার থেকে যে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত সব খবরাখবর সংগ্রহ করে একসঙ্গে একটা মাষ্টার টেপ তৈরি করে ফেলতে পারে! অসুবিধা কোথায়? আজকাল আবার বড় বড় শহরে ঢোকার মুখের রাস্তায় ভিডিও ক্যামেরা বসানো হয়েছে। সারাদিনের প্রতিটি মুহূর্তে শহরে কোন কোন নম্বরের গাড়ি ঢুকছে অথবা বেরুচ্ছে, তার ছবি তুলে কমপিউটারে ভরে দিচ্ছে ভিডিও ক্যামেরা। এছাড়া বিভিন্ন পাবলিক প্লেস ও সুপার মার্কেটেও আছে এই ক্যামেরা। অনেক কলকারখানায় প্রতিটি মেশিনকে যোগ করে দেওয়া হচ্ছে কমপিউটারের সঙ্গে। যেসব শ্রমিক ওই মেশিনে কাজ করবেন তাঁদের ভুলভ্রান্তি বা ফাঁকিবাজি সবই নজর রাখবে কমপিউটার। ধোঁকা দিয়ে মালিককে বোকা বানাবার আর উপায় নেই।

কমপিউটারের এই নজরদারিকে অন্য কথায় বলে 'ইলেকট্রনিক স্পাইং।' আগে শোনা যেত, কমিউনিস্ট দেশগুলির প্রতিটি নাগরিকের ব্যক্তিগত জীবনের ওপর নাকি নজর রাখে রাষ্ট্রের গোয়েন্দা ব্যবস্থা! ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে এ জিনিস ছিল না। কিন্তু জীবনের সর্বস্তরে কমপিউটারের সাহায্য নিতে গিয়ে শেষোক্ত দেশের নাগরিকরা নিজেদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ক্রমশ হারিয়ে ফেলতে ফেলতে আজকাল সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের শতকরা সত্তর ভাগের বেশি নাগরিক কমপিউটারের জন্য

নিজেদের ব্যক্তি-স্বাধীনতা খর্ব হওয়ার আশঙ্কায় ভুগছেন। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে আবার আর এক ভয়। আর, তা হচ্ছে কমপিউটারে কারুর ব্যক্তিগত জীবনের ভুল তথ্য ভরে রাখার। এটা ভুল করেও হতে পারে, আবার শত্রুতা করেও। ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত, যাই হোক না কেন, এর পরিণাম মারাত্মক।

ইতিমধ্যেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কমপিউটারের সাহায্যে সাধারণ নাগরিকদের ওপর সরকারের নজরদারি বন্ধ করার আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। আন্দোলনের চাপে অনেক দেশের সরকারই বাধ্য হয়েছেন বিশেষ আইন প্রনয়নে যার সাহায্যে কমপিউটারে রাখা কোন ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস না হয় এবং তা বের করে নিয়ে কেউ অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করতে পারে। অনেক দেশের সরকার আবার নাগরিকদের জীবনের কোন কোন তথ্য কমপিউটারে রাখা যাবে তাও নির্দিষ্ট করে দিচ্ছেন। কেউ জানে না ভবিষ্যতে কমপিউটারের নজরদারি থেকে বাঁচতে আরো কি হবে? কে বলতে পারে কোথায় কোন কমপিউটার গুপ্তচরের চোখ দিয়ে আপনার সব কিছু নজর করবে? অতএব সাবধান।
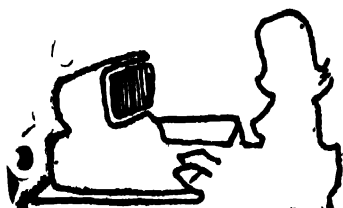
সঙ্গীত সাধনায় কমপিউটার

কেউ যদি প্রশ্ন করেন কমপিউটার কি সুর বাজাতে পারে, এর উত্তর কি হবে? আজকাল তো হাতঘড়ি, টেবিল ঘড়ি, পকেট ক্যালকুলেটার সবই সুর বাজাচ্ছে। সুতরাং, কমপিউটার পারবে না কেন? কমপিউটারও সুর বাজাতে পারে। বড় কমপিউটারের কথা না হয় বাদই দিলাম। ছোটদের ভিডিও গেমস খেলার যন্ত্রগুলিও সুন্দর যান্ত্রিক সুর বাজায়।

শুনলে অবাক লাগে। এই সুর বাজানোর কাজটিও কমপিউটার করে দুটি সংখ্যা দিয়ে অর্থাৎ বাইনারি ডিজিটস দিয়ে। এজন্য যে কোনও সুরের নোটেশনগুলিকে প্রথমে ছোট ছোট সরলভাগে ভাগ করা হয়। তারপর প্রতিটি ভাগকে বাইনারি কোডে রূপান্তরিত করে ভরে দেওয়া হয় কমপিউটারের স্মৃতিতে। এভাবে সব কমপিউটারেই সুর বাজানোর জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম করতে হয়।

আজকাল রেকর্ডিং কোম্পানিগুলি রেকর্ড করার কাজে কমপিউটার ব্যবহার করছে। বিভিন্ন যন্ত্রের সুর বা ঝংকার মেশানো, কোনও একটি সুরের ভিন্ন ভিন্ন রূপে পরিবর্তন ঘটানো, সুর ও তালের নিখুঁত প্রকাশ—এ সব কাজে কমপিউটারের জুড়ি নেই। তবে যন্ত্রসঙ্গীত বাজানোর জন্য কমপিউটারে একটি 'মিউজিক সিনথেসাইজার' বসাতে হয়। সঙ্গীত সাধনায় কমপিউটার রেকর্ড করা ছাড়াও সুর তৈরি, সম্পাদনা ও পরিবর্ধন বা পরিবর্তনের কাজেও লাগানো হচ্ছে। ইউরোপের জ্যাজ বা রক সঙ্গীত আজ সম্পূর্ণ কমপিউটার নির্ভর। পাশ্চাত্তের অনেক দেশে ইতিমধ্যেই খোলা হয়েছে কমপিউটার ব্যবহার করে সঙ্গীত চর্চা শেখার স্কুল।
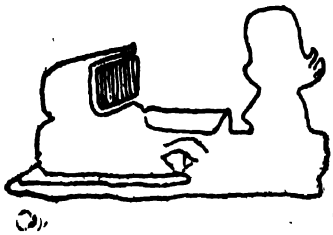
চিত্রশিল্পী কমপিউটার

চিত্রশিল্পী হিসাবে কমপিউটার অনেক ধরণের কাজ করে। টেলিভিশনে ছবি দেখানো, ছবি আঁকা, কার্টুন চিত্র তৈরি করা, বিভিন্ন কাজের নকশা বানানো ছাড়াও স্পেস ফটোগ্রাফিতে কমপিউটার ব্যবহার হয়।

টেলিভিশনে ছবি দেখানোর জন্য স্ক্রীনটিকে কমপিউটার ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে নেয় যাকে বলে 'পিক্সেলস'। প্রতিটি পিক্সেলকে নিয়ন্ত্রণ করে কমপিউটারের এক একটি র‍্যাম বা র‍্যানডম্ এ্যাকসেস মেমরি। কমপিউটারের সঙ্গে টেলিভিশন যুক্ত করে দিলে এই মেমরি বা স্মৃতি থেকে ছবি সরাসরি ফুটে ওঠে স্ক্রীনে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে কমপিউটারের স্মৃতিতে ছবি ঢোকানো যাবে কি করে? এটা খুব কঠিন কাজ নয়। যে কোন ছবিই কমপিউটার চালিত বিশেষভাবে তৈরি ভিডিও ক্যামেরায় তুললে তা বাইনারি কোডে রূপান্তরিত হয়ে কমপিউটারের স্মৃতিতে থেকে যায়। এছাড়া আরো একটি পদ্ধতি আছে।

তা হল, টাইপ করা। সাধারণ টাইপরাইটারে টাইপ করে অনেক টাইপিষ্টই রবীন্দ্রনাথ বা নেতাজীর ছবি আঁকেন। এভাবে কমপিউটারের কি-বোর্ডে টাইপ করে ছবি কমপিউটায়ের স্মৃতিতে ঢোকানো যায়। একবার কমপিউটার স্মৃতিতে কোনও ছবি ঢোকানো হলে কমপিউটার তা বড় ছোট করতে পারে, প্রয়োজনে রং পরিবর্তন করে এবং আকৃতিও বদলে দেয়। এছাড়া ছবি ছাপতেও পারে।

কমপিউটারের ছবি ছাপা ও ছাপার যন্ত্রের ছবি ছাপার মধ্যে তফাত আছে। ছাপার যন্ত্রে হাফটোন ছবি ছাপা হয় অসংখ্য ছোট বড বিন্দু দিয়ে। কমপিউটার ছাপে বিন্দুর বদলে অসংখ্য ক্ষুদ্রাকৃতি বর্গক্ষেত্র ব্যবহার করে যার একটির ক্ষেত্রফল একটি বিন্দুরই সমান হবে। ছবি আঁকা ও ছাপা ছাডাও কমপিউটার গ্রাফ বা রেখাচিত্র আঁকা, বাড়ি বা যন্ত্রপাতির নকশা প্রস্তুত করা, কোনও জায়গার মানচিত্র তৈরি প্রভৃতি কাজেও খুব কুশলী। আজকাল সায়েন্স ফিকশান সিনেমা তৈরির কাজে পরিচালকরা কমপিউটারের সাহায্য নিচ্ছেন। কার্টুন ফিল্ম তো কমপিউটার ছাড়া তৈরিই হচ্ছে না।

মহাকাশযানের ক্যামেরা দিয়ে তোলা ছবিকে পরিস্ফুট করে ও দরকার হলে সাদা-কালো ছবিকে রঙীন ছবিতে পরিবর্তন করে ছাপার কাজে কমপিউটারের ব্যবহার প্রথম থেকেই হয়ে আসছে। কমপিউটার ব্যবহার না করা হলে, লক্ষ লক্ষ মাইল দূর থেকে তোলা গ্রহ উপগ্রহের ছবিগুলি এত স্পষ্ট বোঝা যেত না।

ওয়ার্ড প্রসেসর
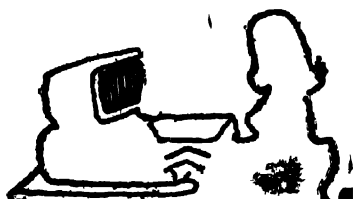
'ওয়ার্ড' শব্দের বাংলা অর্থ শব্দ। আর, 'প্রসেসর' বলতে বোঝায় বিন্যাসকার। দুটি শব্দ এক করলে ওয়ার্ড প্রসেসরকে বাংলায় বলা যায় শব্দ বিন্যাসকার। হ্যাঁ, তথ্য বিন্যাস-এর (ইনফরমেশন প্রসেসিং) মত কমপিউটার শব্দেরও বিন্যাস করতে পারে, অর্থাৎ, নির্দেশমত শব্দ সাজাতে পারে। এজন্য ওয়ার্ড প্রসেসরের কমপিউটারটি বিশেষভাবে নির্মিত। এবার দেখা যাক ওয়ার্ড প্রসেসর কাজ করে কি ভাবে।

ওয়ার্ড প্রসেসর নিয়ে কাজ করতে হলে প্রথমে বসতে হবে কমপিউটারের কি-বোর্ডে। এবার যেসব শব্দ টাইপ করার টাইপ করলে, কমপিউটারের ভিডিও ডিসপ্লে স্ক্রিনে শব্দগুলি দেখা যাবে। এ সময় বানান ভুল বা অন্য কোন শুদ্ধ করার কাজ থাকলে করে নিতে হয়। সব ঠিকঠাক হয়ে গেলে কমপিউটারকে নির্দেশ দিতে হয় কোন টাইপের অক্ষরে ও কতটা চওড়া লাইনে শব্দগুলি

ছেপে দিতে হবে। একাধিক কপির দরকার হলে তাও বলতে হবে এসময়। নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কমপিউটার ছাপার কাজ করবে। আর, এই কাজ করবেও খুব দ্রুত। কারণ, কমপিউটার প্রতি মিনিটে পাঁচশোরও বেশি শব্দ ছাপতে পারে। ছাপা ছাড়াও, শব্দগুলিকে ইচ্ছে করলে ফ্লপি ডিস্কের সাহায্যে ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রহ করা যায়। এই ফ্লপি ডিস্ক ভবিষ্যতে ব্যবহার করে ভিডিও স্ক্রিনে শব্দগুলি পড়া যাবে বা প্রয়োজনে আরো কপি ছাপা যেতে পারে। ওপরের উদাহরণটি শুধু শব্দ ছাপার কথা বলে দেওয়া হলেও, আসলে ওয়ার্ড প্রসেসার খবরের কাগজ, বই ও অন্যান্য ছাপার কাজে ব্যবহৃত হয়।

অনেক ওয়ার্ড প্রসেসরে আবার ডিকশনারি বা শব্দকোষ প্রোগ্রাম করা থাকে। টাইপ করার সময় কোন শব্দের বানান ভুল হলে, ওয়ার্ড প্রসেসর তা শুদ্ধ করতে সাহায্য করে। অবশ্য এজন্য যন্ত্রকে জিজ্ঞেস করতে হয় সঠিক বানান কোনটি। ছাপা বা শুদ্ধ করা ছাড়াও ওয়ার্ড প্রসেসর গুণে বলে দেয় কত শব্দ টাইপ করা হল, দরকার হলে গল্পের নায়কের নাম পাল্টে দতে পারে, সূচীপত্র তৈরি করে ও ফুটনোট বসায়। ইতিমধ্যে বিশ্বের সব ভাষাতেই ওয়ার্ড প্রসেসর তৈরি হয়ে গেছে। শুধু ঝামেলা হয়েছে চাইনিজ ও জাপানী ভাষা নিয়ে কারণ, এই দুটি ভাষার বর্ণমালা খুব জটিল ও বিশাল।

বিদেশে লেখকরা আজকাল টাইপ রাইটারের বদলে ওয়ার্ড প্রসেসর ব্যবহার করছেন। সাংবাদিকরাও কপি লিখছেন ওয়ার্ড প্রসেসরের মাধ্যমে। এর ফলে বই কম্পোজ করার বা সংবাদ কম্পোজ করা, সম্পাদনা ও সাজানোর কাজের ঝঞ্ঝাট অনেক কমে গেছে।
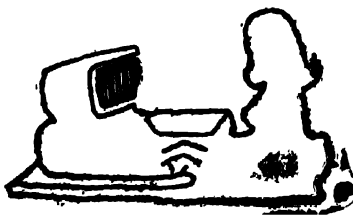
খেলার জগতে কমপিউটার

খেলাধূলার তথ্য ও পরিসংখ্যান রাখা এবং তার বিশ্লেষণ করার কাজ কমপিউটার অনেকদিন ধরেই করে আসছে। এতে বলার মত উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। খেলার জগতে কমপিউটারের উল্লেখযোগ্য কাণ্ড হল, গত কয়েক বছর ধরে কমপিউটার নিজেই খেলোয়াড় হয়ে গেছে। বিশেষ করে দুটি খেলা, দাবা ও চেকার, কমপিউটার খুবই ভাল খেলে। দাবা ও চেকার খেলার জন্য বিশেষ ধরনের কমপিউটারও তৈরি করা হয়েছে। এই দুটি খেলা খেলতে কমপিউটারকে সাহায্য করে প্রোগ্রামার। কমপিউটার দাবা আমেরিকায় এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে যে ওদেশে এখন প্রতিবছর কমপিউটার দাবা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কমপিউটার দিয়ে আর এক ধরনের খেলা সারা বিশ্বে খুবই জনপ্রিয়। এর নাম ভিডিও গেমস।

কমপিউটার দাবা ভাল খেলে কেন? এর একটাই উত্তর। কমপিউটার

হচ্ছে লজিক মেসিন আর, দাবা হচ্ছে লজিকের অর্থাৎ যুক্তির খেলা। মজার ব্যাপার, লজিক মেসিন হওয়া সত্ত্বেও কমপিউটার আজ পর্যন্ত একজন গ্রাণ্ড মাষ্টারকেও দাবায় হারাতে পারেনি। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে বলতে হয়, প্রতিভাবান দাবা খেলোয়াড়রা খেলার অবস্থা বুঝে নতুন নতুন চাল আবিষ্কার করে চালেন যার যোগ্য জবাব কমপিউটার দিতে পারে না। দাবা খেলার কমপিউটারে সে সব চালই প্রোগ্রাম করা থাকে যা আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। কমপিউটারের প্রতিভা নেই। ভেবে ভেবে নতুন চাল বের করবে কি করে? আজকাল শিক্ষার্থী দাবা খেলোয়াড়দের কোচিং-এর কাজেও কমপিউটার ব্যবহার করা হচ্ছে।

দাবার চেয়ে কমপিউটার চেকার আরো ভাল খেলে। ১৯৬২-তে আমেরিকার চেকার চ্যাম্পিয়ান রবার্ট নিলে-কে চেকার খেলায় হারিয়ে দিয়েছিল একটা আইবিএম ৭০১৪ কমপিউটার। কমপিউটার চেকার ভাল খেলে কারণ দাবার চেয়ে এটি সহজ খেলা এবং চালের সংখ্যাও সীমিত।

কমপিউটার দিয়ে বহু ধরনের ভিডিও গেমস খেলা যায় এবং ভিডিও গেমস খেলার জন্যই এক বিশেষ ধরনের কমপিউটার তৈরি করা হয়। দু' ধরনের ভিডিও গেমস আছে। এদের নাম 'আরকেড গেমস' ও 'হোম গেমস'। হোম গেমসগুলির প্রোগ্রাম বদল করা যায় ফলে বিভিন্ন ধরনের খেলা যায়। আরকেড গেমস-এ তা সম্ভব নয়। অন্যদিকে আরকেড গেম খেলার যন্ত্র বেশি দামী। এই গেম খেলার কমপিউটারে থাকে বিশেষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, পর্দা (ভিডিও স্ক্রিন) ও শব্দ প্রক্ষেপণের ব্যবস্থা। হোম গেমস খেলার কার্টিজে থাকে একটা প্রোগ্রাম করা 'রম' চিপ। শুধু ভিডিও গেমস খেলার জন্য যে কমপিউটার আছে তার নাম 'ভিডিও গেম কনসোল'। সম্প্রতি আমেরিকায় 'জেনাস' নামে যুদ্ধ নিয়ে খেলার এক ভিডিও গেম তৈরি হয়েছে। এই খেলা আসল যুদ্ধের মতই প্রায়। সামরিক বাহিনীর লোকেরাও এই খেলাটি খেলতে পছন্দ করেন নকল যুদ্ধের উত্তাপ অনুভব করতে।

কমপিউটার নিয়ে আর এক ধরনের খেলা বিদেশে খুবই প্রিয়। একে বলে 'এ্যাডভেঞ্চার গেম'। এ খেলায় কমপিউটার একটি কাল্পনিক রোমাঞ্চকর পরিস্থিতি তৈরি করে। ধরে নিতে হয় যে, কমপিউটার নিয়ে খেলছে সে ওই পরিস্থিতিতে পড়ে খুবই বিপদগ্রস্ত। উদাহরণ, কমপিউটার খেলোয়াড়কে একটা ভুতুড়ে বাড়িতে ঢুকিয়ে দিয়েছে। এখন কিভাবে ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবে,

এই নিয়ে খেলা।

কমপিউটার ব্যবহার করে ভিডিও গেমস খেলা সেই পঞ্চাশের দশক থেকেই শুরু হয়েছিল। তবে জনপ্রিয় হয় সত্তর দশকের প্রথমে। এ-ধরনের খেলা জনপ্রিয় করার পেছনে নোলান বুশনেল ও র‍্যালফ বেয়ার-এর প্রধান অবদান। নোলান যে ভিডিও গেমটি প্রথম তৈরি করেছিলেন তার নাম ছিল 'পং' যা আদতে ছিল ভিডিও যন্ত্রে টেবিল টেনিস খেলা। 'স্পেস ইনভেডার', 'প্যাক-ম্যান' 'ডাঙ্কি কং' প্রভৃতি আজকের বিখ্যাত ভিডিও গেমগুলির সবই জাপানে তৈরি। আজকাল সাধারণ ভিডিও রেকর্ড প্লেয়ার ও টি ভি দিয়ে খেলার উপযোগী রেকর্ড করা ভিডিও ক্যাসেট গেমসও বেরিয়েছে।

কমপিউটার নিয়ে বিদেশে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যেসব খেলা খেলে তার মধ্যে আছে শব্দ তৈরি, মজার ছবি আঁকা, নানা ধরণের পিলে চমকানো বা সুমধুর আওয়াজ বানানো, কোন কাজের পরিকল্পনা করা যেমন, পিকনিক করতে গেলে কি কি করতে হবে, ক্যালিডোস্কোপ তৈরি করা প্রভৃতি। ছোটদের আরো কিছু খেলার মধ্যে আছে 'হ্যাপি বার্থডে', 'গ্যালাকটিক গাইড', 'ফ্লাইং', 'চান্স টেকিং', 'ষ্টার সাইনস' বানানো, কমপিউটারের সাথে কথা বলা, 'টাংটুইষ্টিং' ও কমপিউটারে গল্প লেখা।

খেলাধূলার জগতে কমপিউটারের সর্বাধুনিক ব্যবহার হচ্ছে খেলোয়াড়দের কমপিউটার লাগানো জুতো পরিয়ে ট্রেনিং দেওয়া। এ ধরণের জুতো পরিয়ে ট্রেনিং দিলে ট্রেনিং-এর সময় কমপিউটার খেলোয়াড়ের দম, শ্বাসপ্রশ্বাসের ধরণ, রক্তচাপ, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া প্রভৃতি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য ধরে রাখে যা পরে ট্রেনারকে সাহায্য করে ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণের হেরফের করতে।
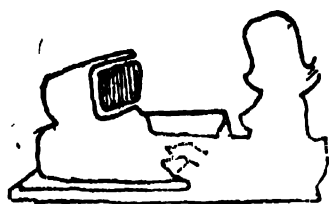
স্কুলে কলেজে কমপিউটার

ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া শেখানোর কাজে কমপিউটারের ব্যবহার উন্নত দেশগুলিতে খুবই প্রচলিত। ওসব দেশের সব স্কুল কলেজেই কমপিউটার আছে। সম্প্রতি আমাদের দেশেরও কিছু নির্বাচিত স্কুলে কমপিউটার বসানো হয়েছে। স্কুলে কমপিউটার বসানো শুরু হয়েছে পার্সোনাল কমপিউটার বানানো শুরু হবার পর। বড় বড় কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানে গবেষণার কাজ হয়, সেখানে পার্সোনাল কমপিউটারের বদলে বড় কমপিউটার বসানো হয়। গবেষণা ছাড়াও, এই বড় কমপিউটারের সাহায্যে ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণ, লাইব্রেরীর বইয়ের লেনদেন, পরীক্ষার মার্কশীট তৈরি ও আরো বহু কাজ করা সম্ভব। উন্নত দেশের কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা যখন পড়তে যায়, কমপিউটার ব্যবহার করা তার আগেই শিখে ফেলে। ফলে গবেষণার জন্য বা

লাইব্রেরীতে রেফারেন্স খুঁজতে কমপিউটারের সাহায্য তারা অন্য কারুর সাহায্য ছাড়াই নিতে পারে।

ছাত্রছাত্রীরা সাধারণত কমপিউটার ব্যবহার করতে শেখে স্কুলে। সত্য কথা বলতে কি, স্কুলে কমপিউটার পড়াশুনা শিখতে যতটা না সাহায্য করে, তার থেকে বেশি সাহায্য করে কমপিউটার ব্যবহার শিখতে। এক দিক থেকে কমপিউটার প্রফেশনালস তৈরির এটা প্রথম পদক্ষেপ। পড়াশুনা শেখার ব্যাপারে কমপিউটারের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি হয় অঙ্ক ও বিদেশী ভাষা শেখাতে। এছাড়া অন্য বহু বিষয়ের প্রশ্নোত্তর কমপিউটারে ভরা থাকে, যা ছাত্রছাত্রীরা ইচ্ছে হলে কমপিউটার থেকে জেনে নেয়। ছুটির পর ছাত্রছাত্রীরা যদি কমপিউটার গেমস খেলতে চায়, তারও ব্যবস্থা থাকে অনেক স্কুলের কমপিউটারে।

কমপিউটার প্রযুক্তিবিদ্‌দের ধারণা ভবিষ্যতে কমপিউটার প্রাইভেট টিউটারেরও কাজ করবে। বিভিন্ন বিষয়ের প্রোগ্রাম করা ক্যাসেট বাজারে কিনতে পাওয়া যাবে যা হোম কমপিউটারে ব্যবহার করলে পড়া শিখতে আর কোন অসুবিধাই হবে না! এমনও হতে পারে, ভবিষ্যতে হয়ত আর স্কুলেই যাবে না কেউ! টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে হোম কমপিউটারকে স্কুলের কমপিউটারের সঙ্গে যোগ করলে, ঘরে বসেই স্কুলের লেসনগুলি পাওয়া যাবে! এক দিক থেকে এটা ভবিষ্যতের পড়ুয়াদের জন্য খুবই আনন্দের খবর। মাষ্টার মশায়ের বকুনি আর, হোমটাস্কের জ্বালাতন থাকবে না। কিন্তু নতুন বইয়ের গন্ধ, স্কুলের সরস্বতী পুজো, বন্ধুদের সঙ্গে গল্প-গুজব, এগুলিও তো জীবন থেকে মুছে যাবে। এটা কি দুঃখজনক নয়? তবে অনেকের ধারণা কমপিউটার পুরোপুরি মাষ্টারমশাইদের বিকল্প হতে পারবে না কোনদিনই।
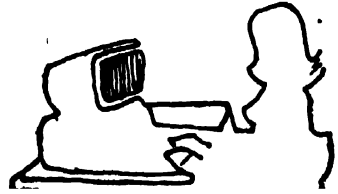
সাহিত্যে সিনেমায় কমপিউটার

কল্পবিজ্ঞান লেখকরা তাদের লেখায় কমপিউটারের মত এক বুদ্ধিমান যন্ত্রের কথা বলতে শুরু করেছেন কমপিউটার তৈরির বহু আগে থেকেই। ১৯২১-এ লেখা কল্পবিজ্ঞান গল্প 'দি থট মেশিন' সম্ভবত কমপিউটার নিয়ে লেখা প্রথম গল্প। 'রোবট'-এর মতই প্রথমদিকের গল্পে কমপিউটারকে মানুষের বন্ধু অপেক্ষা ক্ষতিকারক যন্ত্র হিসেবেই বেশি করে চিহ্নিত করা হয়েছে। এমনকি বিখ্যাত ইংরেজ লেখক ই.এম. ফরষ্টার তার গল্প 'দি মেসিন ষ্টপস'-এ এমন কথাও লিখেছেন যে ভবিষ্যতে মানুষের সব কাজ করতে করতে কমপিউটার একদিন মানব সভ্যতার অগ্রগতিকে রুদ্ধ করে দেবে। জুলে ভার্ণে ও এইচ. জি. ওয়েলসের লেখায় বর্ণিত যান্ত্রিক ভবিষ্যতের কথা ভেবেই হয়ত ফরষ্টার এই লেখা লিখেছিলেন! মানুষের হাত থেকে কমপিউটার যদি সত্যিই ক্ষমতা কেড়ে নেয় তাহলে পৃথিবী কিভাবে ধ্বংস হবে তার বর্ণনা আছে 'টুমরো সামটাইমস কামস'

গল্পে। এ গল্পের কমপিউটার চরিত্রের নাম 'ম্যাকিন্টভ্যাক'। কমপিউটার নিয়ে লেখা আরো দুটি বিখ্যাত কল্পবিজ্ঞান গল্পের নাম 'দি লাষ্ট কোয়েশ্চেন' ও 'দি এ্যানসার'।

কমপিউটার নিয়ে যে টেলিভিশন সিরিয়ালটি খুব বিখ্যাত হয়েছিল তার নাম 'দি হিচহাইকারস গাইড টু দি গ্যালাক্সি'। এই সিরিয়ালের প্রধান চরিত্রে ছিল 'ডিপথট' নামে এক কমপিউটার। সিনেমায় কমপিউটার প্রথম চরিত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৬৮-তে। আর্থার সি. ক্লার্কের উপন্যাস অবলম্বনে ষ্ট্যানলি কুব্রিকের তৈরি ছবি '২০০১ : এ স্পেস অডেসি'-তে। এই কমপিউটার তারকার নাম ছিল 'হাল'। 'ষ্টার ট্রেক' ছবিটি যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা ওই ছবির ষ্টার শিপ এণ্টারপ্রাইজের কমপিউটারটির কাণ্ডকারখানার কথাও বহুদিন মনে রেখেছেন নিশ্চয়ই। এই একটি কমপিউটার কি কাজই না করতো? ষ্টার শিপটি চালানো, নিয়ন্ত্রণ করা, শিপের ভেতর মাধ্যাকর্ষণ ও বায়ুর চাপ ঠিক রাখা, বিপদের আশংকা দেখা দিলে সবাইকে সতর্ক করে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া ও আরো বহু ধরণের কাজ যার সবই করতো শুধু মৌখিক নির্দেশে।

কল্পবিজ্ঞান লেখক ও চিত্র পরিচালকরাই বোধহয় প্রথম কমপিউটার তৈরির কাজে জৈব পদার্থ ব্যবহারের স্বপ্ন দেখেছিলেন। ১৯৩১-এ লেখা গল্প 'দি সেরিব্রাল লাইব্রেরি'-তে এমন একটা কমপিউটারের উল্লেখ আছে যার স্মৃতি-ভাণ্ডার তৈরি হয়েছে পাঁচশো মানুষের মস্তিষ্ক দিয়ে। পরবর্তী সময়ে এমন অনেক গল্প লেখা হয়েছে যার রোবটগুলির মগজে ছিল মানুষের মস্তিষ্ক। মানুষের মস্তিষ্ক সমন্বিত এ ধরণের রোবটের নাম 'সাইবর্গ'। টেলিভিশন ছবি 'সিক্স মিলিয়ন ডলার ম্যান'-এ প্রথম আমরা সাইবর্গ দেখতে পাই।

টেলি প্রসেসিং কিভাবে হয়
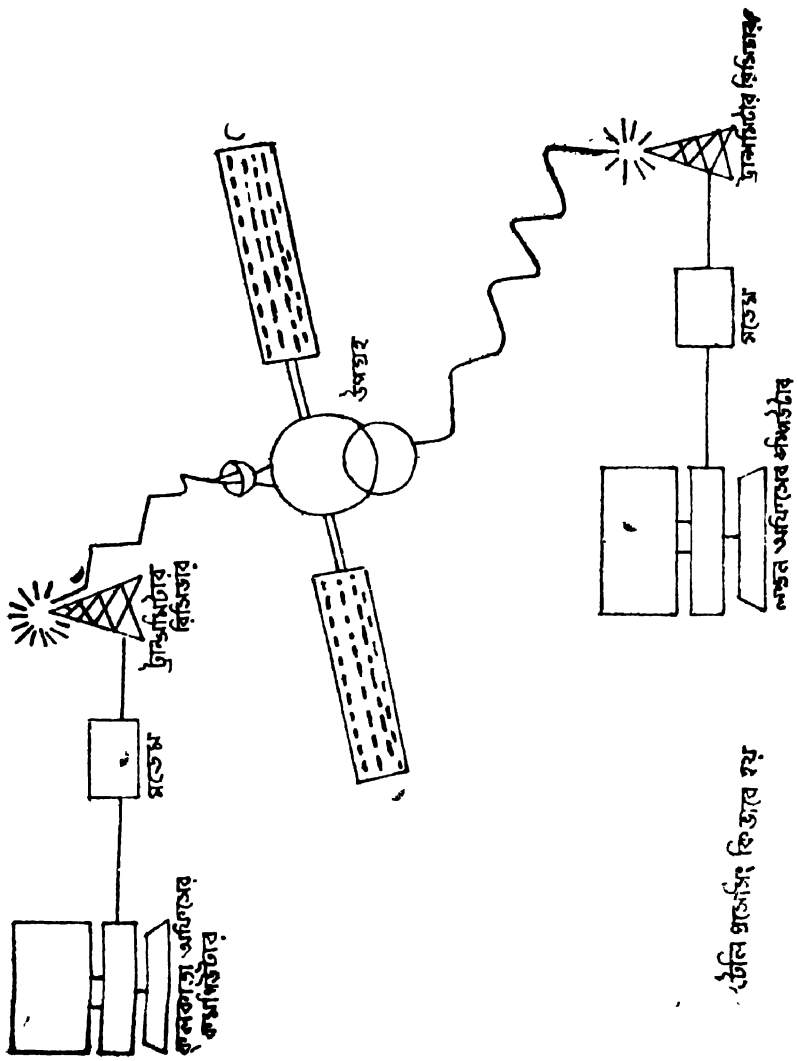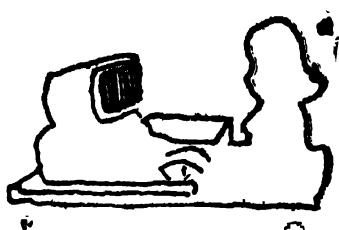
টেলি প্রসেসিং

ধরা যাক কেউ বিমানে লণ্ডন হয়ে নিউইয়র্ক যাবেন। লণ্ডনে দিন কয়েক থাকবেন নিউইয়র্ক যাবার আগে। বিমান কোম্পানি কলকাতা অফিসের কমপিউটারের সাহায্যে লণ্ডন অফিসের কমপিউটার থেকে রিজার্ভেশনের খবর এনে লণ্ডন থেকে নিউইয়র্ক যাবার টিকিট রিজার্ভ করে দিল। লণ্ডন অফিসের কমপিউটারকে জানিয়েও দিল অমুক তারিখের অমুক ফ্লাইটের অমুক সিট নম্বরে বসে কে লণ্ডন থেকে নিউইয়র্ক যাবে।

কলকাতায় বসে লণ্ডন থেকে নিউইয়র্ক যাবার এই ব্যবস্থা করা সম্ভব হল যে ব্যবস্থার মাধ্যমে তার নাম 'টেলি প্রসেসিং'। 'টেলি' গ্রীক শব্দ। এর অর্থ দূরত্ব। টেলি প্রসেসিং বলতে বোঝায়, দূর থেকে ব্যবস্থা করা। এই ব্যবস্থা করার জন্য তথ্য এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পাঠানোর প্রয়োজন হয়। এবং এই পাঠানোর প্রয়োজনে তথ্য বা পরিসংখ্যানের অবস্থাগত

পরিবর্তন দরকার হয়। এটা করা হয় 'মডেম' নামে এক যন্ত্রের সাহায্যে। মডেম যে কোন তথ্যকে এক বিশেষ ধরণের তরঙ্গে পরিণত করে বা টেলিফোন তারের মাধ্যমে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পৌঁছে দিতে সাহায্য করে। মডেম একই সঙ্গে মডুলেটর ও ডিমডুলেটর।

কলকাতার ওই বিমান অফিসে যাত্রীর তথ্য কমপিউটারে ভরে নির্দেশ দেবার পর কমপিউটার তা মডেম-এ পাঠিয়ে দিল। মডেম তথ্যকে মডুলেট করে অর্থাৎ এক বিশেষ ধরণের তরঙ্গে রূপান্তরিত করে উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে লণ্ডন অফিসের কমপিউটারে পাঠিয়ে দিল। লণ্ডন অফিসের কমপিউটারের মডেম এবার ডিমডুলেট করে অর্থাৎ তরঙ্গায়িত তথ্যকে কমপিউটারের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় পরিবর্তিত করে তা কমপিউটারে ভরে দিল। কমপিউটারের প্রিণ্টার বা ভিজুয়াল ডিসপ্লে ইউনিট লণ্ডন অফিসকে জানিয়ে দিল কলকাতা অফিস থেকে কি খবর জানতে চেয়েছে। একই সঙ্গে কমপিউটার উত্তরও পাঠিয়ে দিল কলকাতা অফিসে।
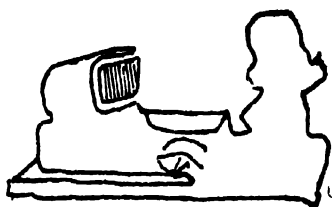
কমপিউটার ক্রাইম

আমেরিকা, জাপান ও ইউরোপের দেশগুলিতে কমপিউটার ব্যবহারের সুযোগকে খারাপভাবে কাজে লাগিয়ে অপরাধ জগতে উন্মোচিত হয়েছে এক নতুন দিগন্ত। পুলিশের খাতায় এর নাম 'কমপিউটার ক্রাইম'। আর, যারা এই ক্রাইম করে তাদের বলে 'কমপিউটার ক্রিমিনাল'।

কমপিউটার নিজে কোন অপরাধ করতে পারে না কিন্তু এই যন্ত্রের কর্মদক্ষতার সুযোগ নিয়ে অপরাধীরা কাজ হাসিল করে। অপরাধের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা টের পাওয়া যায় না। যখন জানা যায়, পুরো ব্যাপারটাই চলে যায় আয়ত্তের বাইরে। এধরণের অপরাধের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, অপরাধীরা কেউ সাধারণ চোর ডাকাত নয়। সবাই শিক্ষিত, এবং কমপিউটার চালনায় পারদর্শী। ব্যক্তিগত লোভের শিকার হয়ে কোনও আক্রোশ চরিতার্থ করতে এসব অপরাধ করে। কিভাবে করে, এবার তাই বলি।

ধরা যাক কোন ব্যাংকে এক ব্যক্তির একাউন্ট আছে এবং বেশ কিছু টাকাও আছে সেই একাউন্টে। যে কোন কারণেই হোক একাউন্ট হোল্ডার তাঁর এই ব্যাংক একাউন্টে বেশ কয়েক বছর টাকা জমাও দিচ্ছেন না বা তুলছেনও না। এখন ব্যাংকের যে কর্মচারীটি কমপিউটার চালায় সে এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করে ঠিক করলো ওই একাউন্টের টাকাটা মেরে দিতে হবে। প্রথমে সে পরিচিত কয়েকজনকে দিয়ে ওই ব্যাংকের অন্য কোন শহরের শাখায় ভুয়া নামে কয়েকটা একাউন্ট খোলালো। এবার কমপিউটারকে নির্দেশ দিল প্রথম ব্যক্তির একাউন্ট থেকে ভুয়া একাউন্টে টাকা ট্রান্সফার করতে। যেহেতু ওই ব্যাংকের সব ব্রাঞ্চের কমপিউটারগুলি ব্যাংকের হেডঅফিসের মাষ্টার কমপিউটারের মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত, মুহূর্তের মধ্যেই ট্রান্সফার হয়ে গেল টাকা। এবার ভুয়া একাউন্টের মালিকরা ইলেকট্রানিক কাউন্টার থেকে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক কার্ড ব্যবহার করে টাকা তুলে নিল। কেউ জানতেও পারলো না। যেদিন প্রতারিত একাউন্টের মালিক তাঁর একাউন্টে আবার টাকা জমা দেবেন বা তুলবেন বা ব্যাংক থেকে পাঠানো মাসিক হিসাব পরীক্ষা করবেন, সেদিন ধরতে পারবেন এই প্রতারণা। আর, যদি ওই একাউন্টের মালিক মরে গিয়ে থাকেন বা ওই টাকাটা যদি তার কালো টাকা হয়, এই অপরাধের কথা কেউ জানতেও পারবে না।

এতো গেল এক ধরণের অপরাধ। এবার আর এক ধরণের কথা বলি। বিভিন্ন সংস্থায় কমপিউটার চালায় মাইনে দিয়ে রাখা কর্মচারীরা। এইসব কর্মচারীদের সঙ্গে কখনো মালিকদের ঝগড়া হলে বা কর্মচারীদের ইউনিয়ন মালিককে শায়েস্তা করতে, কমপিউটারের মেমরিকে ইচ্ছাকৃত ভাবে নষ্ট করে দেয় বা মেমরিতে ভরে দেয় ভুল তথ্য ও পরিসংখ্যান। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে চিরতরে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে কমপিউটারটিকে। কমপিউটার বসানোর পর আর কোন সংস্থাই সাধারণত খাতাপত্রে হিসেব রাখে না। উৎপাদন, বিক্রি, টাকা আদায়, খরচ, লাভ—সব হিসাবই রাখে ওই কমপিউটার। এখন এই কমপিউটার যদি নষ্ট হয়ে যায় বা বেঠিক হিসাব দেয়, তাহলে মালিকের মাথায় হাত। এ ধরণের আরো বহু অপরাধই হচ্ছে কমপিউটারের সাহায্য নিয়ে। কমপিউটার থেকে গোপন খবর বের করে ব্ল্যাকমেইল করার পেশাতেও ধীরে ধীরে নামছে বড় বড় সংগঠিত অপরাধীর দল। এ অপরাধের শিকার হচ্ছেন সমাজের ধনী-মানী ব্যক্তিরা। আজকাল অনেক সংস্থার কমপিউটার থেকে

মূল্যবান তথ্য ও পরিসংখ্যান চুরি করে বিক্রী করছে অপরাধীরা। কমপিউটার ঘটিত যে অপরাধটি অহরহ ঘটে তা হল কমপিউটারের সময় চুরি করা, অর্থাৎ কোন কমপিউটারের মালিককে না বলে, মজুরী না দিয়ে, তাঁর কমপিউটার লুকিয়ে ব্যবহার করে নিজের কাজ করে নেওয়া।

আজ পর্যন্ত যেসব কমপিউটার ক্রাইম ধরা পড়েছে তার মধ্যে আমেরিকার ইকুইটি ফাণ্ডিং কেস সবচেয়ে বড়। ইকুইটি ফাণ্ডিং ছিল আমেরিকার এক বিখ্যাত বীমা কোম্পানি। এই কোম্পানিকে বেশি দামে বিক্রীর জন্যে কোম্পানির কর্মকর্তারা কোম্পানির বিক্রি করা বীমার সংখ্যা কোম্পানির কমপিউটারে বেশি করে দেখিয়ে রেখেছিলেন। বিক্রি হবার অনেকদিন পর নতুন মালিক এটা জানতে পেরে কোর্টে কেস করেন।

ব্যক্তিগতভাবে চ্যাম্পিয়ান কমপিউটার ক্রিমিনাল কে? টাইম ম্যাগাজিনের খবর অনুযায়ী লস এঞ্জেলসের ষ্ট্যানলি মার্ক রিফকিন-কে এই খেতাব দেওয়া যেতে পারে। ষ্ট্যানলি পেশায় একজন কমপিউটার এ্যানালিষ্ট। ক্যালিফোর্ণিয়া ব্যাংক থেকে টাকা তছরূপের দায়ে দুবার ধরা পড়েন। প্রথমবার দশ মিলিয়ন ডলার সরাবার চেষ্টায় আর, দ্বিতীয়বার এর পাঁচ গুণ অর্থাৎ পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার। কমপিউটারের সাহায্য নিয়ে চুরি করার জন্য আমেরিকার আর এক চোরও পৃথিবী বিখ্যাত। এর নাম জেরি স্নেইডার। উনিশ বছর বয়সে জেরি আমেরিকার প্যাসিফিক ডাক ও তার কোম্পানির সেণ্ট্রাল কমপিউটারকে নির্দেশ দিয়ে বহু লক্ষ ডলারের যন্ত্রপাতি চুরি করেন।

দেশে দেশে কমপিউটার ব্যবহার যত বাড়ছে, বাড়ছে কমপিউটার ক্রাইম। এই ক্রাইম দমনে বিভিন্ন দেশের পুলিশ বিশেষভাবে গঠন করা কমপিউটার ক্রাইম কণ্ট্রোল ডিপার্টমেণ্ট খুলেছে। এই ধরণের অপরাধ দমনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে পুলিশকে। বিভিন্ন ব্যাংক ও বড বড় সংস্থায় পুলিশের লোক কমপিউটারকে দেওয়া তথ্য ও নির্দেশগুলি নিয়মিত যাচাই করে দেখছেন। একটা কমপিউটারকে চালাচ্ছে বিভিন্ন লোক। একজন জানতে পারছে না আর একজনের প্রোগ্রাম কোড। আরো অবাক ব্যাপার, এই কমপিউটার ক্রাইম দমন করতে পুলিশকে সেই কমপিউটারেরই সাহায্য নিতে হচ্ছে। শেষ করার আগে কমপিউটার ক্রাইম দমন নিয়ে এক বিশেষজ্ঞের অভিমত বলি। আমেরিকার 'ফরচুন' ম্যাগাজিনের সঙ্গে এক সাক্ষাতকারে তিনি বলেছিলেন, কমপিউটার ক্রাইম দমনের শ্রেষ্ঠ উপায় প্রোগ্রামারকে মেরে ফেলা। এটা কি ঠিক কাজ? নিশ্চয়ই নয়।
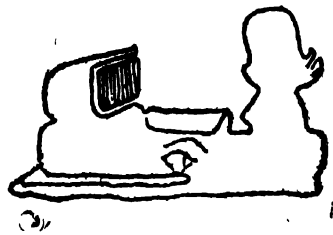
কমপিউটার কি ভুল করে

কমপিউটার কি ভুল করে ? এর উত্তর, হ্যাঁ করে। কখন ? সাধারণত দু রকম পরিস্থিতিতে এই ভুল হয়। প্রথম, কমপিউটারের কোন যন্ত্রাংশ খারাপ হয়ে গেলে। ব্যবহার করতে করতে যা হতেই পারে। আর দ্বিতীয় পরিস্থিতি হচ্ছে, যদি কমপিউটারে প্রোগ্রামার বা নির্দেশক ভুল তথ্য ভরে দেয় বা ভুল নির্দেশ দেয়। প্রোগ্রামার যেহেতু মানুষ, কাজ করতে গিয়ে তার ভুল করে ফেলা খুব অস্বাভাবিক নয়।

প্রথম ভুল ধরা পড়লে কমপিউটারের খারাপ যন্ত্রাংশ সারাতে হবে। তাহলেই হল। কিন্তু দ্বিতীয় ধরণের ভুল যেহেতু যে কোন সময় ঘটতে পারে, সেজন্য সব সময় সতর্ক থাকা দরকার। এজন্য কমপিউটারে যখন তথ্য ভরা হয় তখন আর একজন অপারেটরকে 'ভেরিফায়ার' মেশিন দিয়ে বসিয়ে ঠিক তথ্য কমপিউটারে ভরা হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করা যায়। যদি নির্দেশ দেওয়ার সময় কোন ভুল হয় সেই ভুল ধরা খুব সহজ নয়। যে কাজের মাধ্যমে এই ভুল সন্ধান করা হয় তাকে বলে 'ডি বাগিং'। কমপিউটার ঠিকমত কাজ করছে কিনা এজন্য পরীক্ষামূলক নির্দেশ (টেষ্ট প্রোগ্রাম) দিয়ে অনেক সময় কমপিউটারের বিভিন্ন অংশকে পরীক্ষা করা হয়।
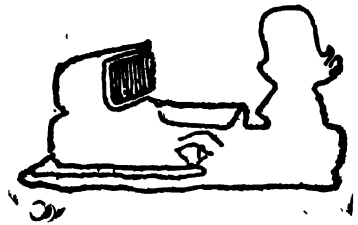
কমপিউটার কি চাকরী খাবে

কমপিউটার ব্যবহার হলে কি কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা সংকুচিত হবে? সাদা কথায়, কমপিউটার কি চাকরী খাবে? বাড়াবে বেকারের সংখ্যা?

আমেরিকার জনগণনা দপ্তর উনবিংশ শতকের শেষে যখন প্রথম স্বয়ংক্রিয় পাঞ্চকার্ড বাছাইয়ের যন্ত্র বসিয়েছিল, কমপিউটার চাকরী খাবে কি খাবে না, এই বিতর্কের তখন থেকেই জন্ম। এটা ঠিক, উন্নত দেশগুলিতে কমপিউটার বসানোর পর অসংখ্য হিসাবরক্ষক ও কেরাণির পদ চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। নতুন তৈরি সংস্থাগুলিতেও অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যায় লোক নিয়োগ হচ্ছে। কারখানায় কমে গেছে শ্রমিক নিয়োগের সংখ্যা। উন্নত দেশগুলিতে এখন লিফটম্যান ও টেলিফোন অপারেটর নেই বললেই চলে। খুব শীগগিরি আর ট্রেনের ড্রাইভারও লাগবে না।

সরাসরি কমপিউটার ব্যবহারের ফলে লোক নিয়োগের সংখ্যা কমা ছাড়াও,

কমপিউটার চালিত রোবট উন্নত দেশের কলকারখানায় অতি দ্রুত শ্রমিকদের জায়গা অধিকার করে নিচ্ছে। নতুন যেসব গাড়ি তৈরির কারখানা হচ্ছে জাপান ও আমেরিকায়, সেখানে কাজ করবে প্রায় সবই রোবট শ্রমিক। এমনকি বাড়ির কাজেও কেউ আর ঝি চাকর রাখছে না ওসব দেশে। হোটেল রেস্তোরাঁতেও কাজ করছে রোবট ওয়েটার।

ওপরের তথ্যগুলি পড়ার পর এটা নিশ্চিন্ত বোঝা যায় যে কমপিউটারের ব্যবহারের কয়েক ধরণের কাজে নিয়োগের সম্ভাবনা ক্রমশই সংকুচিত বা অবলুপ্ত হচ্ছে। সুতরাং যাঁরা বলছেন যে কমপিউটার ব্যবহার বাড়লে বেকারও বাড়বে, তাঁরা বোধহয় ঠিক! এবার অন্যপক্ষের যুক্তি শোনা যাক, যাঁরা কমপিউটার ব্যবহার বাডাতে আগ্রহী।

এই দ্বিতীয় পক্ষের লোকেদের মতে, মানবসভ্যতার অগ্রগতির বিভিন্ন পর্যায়ে যখনই কোন যন্ত্রের ব্যবহার চালু হয়েছে, কর্মচ্যুতি ঘটেছে কিছু লোকের। কমপিউটারের জন্যেও যে এই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে, তা স্বাভাবিক। তবে এই কর্মচ্যুতি বা বেকারত্ব বৃদ্ধি হবে সাময়িক। এর জন্য ধর্মঘট, স্লোগান, বয়কট করার কোন প্রয়োজন নেই। যে যন্ত্র অনেক দেশে কিশোর কিশোরীর খেলার যন্ত্র তাকে এত ভয় পাওয়া অমূলক। এবার বলি দ্বিতীয় পক্ষ কেন কমপিউটার ভীতিতে ভয়ার্ত হতে না বলছেন।

এর প্রথম কারণ হচ্ছে কমপিউটার একটি যন্ত্র। এই যন্ত্র চালাতে দরকার কমপিউটার অপারেটর ও কমপিউটার প্রোগ্রামার। খারাপ হলে সারাতে লাগে কমপিউটার টেকনিসিয়ান। কমপিউটার তৈরির কারখানাতেও দরকার অনেক দক্ষ ও অদক্ষ কর্মীর। ফলে কমপিউটার শিল্পেই প্রচুর লোক নিয়োগের সম্ভাবনা আছে। কমপিউটার বসানোর জন্য অন্য শিল্পে যাদের চাকরী যাবে বা নিয়োগ হবে না, কমপিউটার শিল্পেই তাদের অনেকের নিয়োগ হবে। এছাড়া কমপিউটার তৈরি ও ব্যবহার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শিল্পেও, যাকে এ্যানসিলারি ইণ্ডাষ্ট্রি বলে, নিয়োগের সম্ভাবনা আছে।

এ কথাটা আজ স্বীকার করতে দ্বিধা নেই অনেক শিল্পেই কমপিউটার ব্যবহার উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদিত বস্তুর মান উন্নয়ণ এবং কাঁচামাল ও উৎপাদনের খরচ কমিয়ে সেই শিল্পের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনতে সক্ষম যা পরোক্ষভাবে জাতীয় অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করবে। আর, দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হলে জনগণের জীবনযাপনের মান উন্নত হবে। সুতরাং কমপিউটার ব্যবহারে বাধা কোথায়।

কমপিউটার তো চাকরী খাবার বদলে চাকরীর সম্ভাবনা বাড়াচ্ছে।

কমপিউটারের ব্যবহারের স্বপক্ষে যে যুক্তিগুলো দ্বিতীয় পক্ষ দেখাচ্ছেন তাও ফেলার নয়। তবে একটু ভাবার আছে। উন্নত দেশগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নগণ্য। অনেক দেশে নিম্নমুখী। ওসব দেশে চাকরী প্রার্থীর হারও বাড়ে কম। ফলে এক পেশা থেকে অন্য পেশায় লোক সরানো সম্ভব। তাছাড়া সরকার বেকার ভাতা দেয়। ফলে লোক কিছুদিন বেকার থাকলেও না খেয়ে থাকে না। কিন্তু আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে যেখানে প্রতিদিন কয়েক লক্ষ বেকার বাড়ছে, যেখানে সরকারের বেকার ভাতা দেবার ক্ষমতা নেই, সেখানে কি এসব যুক্তি খাটে? বোধহয় না! আরো ভাববার বিষয়, সবকিছু 'কমপিউটারাইজ' করতে যে পরিমাণ অর্থের ও রসদের প্রয়োজন তা কি আমাদের আছে? বা, যে অর্থ ও রসদ আছে তা কি জনজীবন ও অর্থ নৈতিক উন্নয়নের অন্য কোন খাতে ব্যবহার করা আরো জরুরী? এ দুটি প্রশ্নের উত্তরে হয়ত অনেকে এমন কথা বলবেন যা কমপিউটার ব্যবহারের বিপক্ষে যায়! তবে কি আমাদের মত দেশে কমপিউটার ব্যবহার করা ঠিক হবে না? আমরা কি কমপিউটারকে দূর দূর করে দূরে সরিয়ে রাখবো?

এর উত্তর, না: কমপিউটারকে দূরে সরিয়ে রাখাও ঠিক হবে না! মানব সভ্যতার উন্নতির তালে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে তা সম্ভবও হবে না! কমপিউটার তার অপরিসীম ক্ষমতায় সব বাধা অগ্রাহ্য করেই আমাদের জীবনে ঢুকে পড়বে। ইতিমধ্যেই ঢুকতে শুরু করে দিয়েছে। এখন আমাদের উচিত এই যন্ত্রকে সাদরে বরণ করা এবং সঙ্গে সঙ্গে স্থির করা কোন কাজে এই যন্ত্রকে আমরা ব্যবহার করবো। এই ব্যবহারের সিদ্ধান্ত এমনভাবে নিতে হবে যাতে সামগ্রিকভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি হয়, দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়ন হয় এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান ও সুখ সুবিধা বৃদ্ধি পায়। একটা বিষয় মনে রাখা দরকার, কমপিউটার কখনোই মানুষের ক্ষতি করতে পারে না যদি না মানুষ এই যন্ত্রকে মানুষের ক্ষতির কাজে নিজেই ব্যবহার করে।
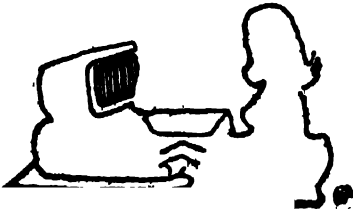
ভারতে কমপিউটার শিল্প

কমপিউটার শিল্প স্থাপনে ভারত এখন একেবারেই শুরুর পর্যায়ে। আশির দশকের গোড়ায় এ কাজের শুরু হয়েছিল। সুতরাং, ছ-সাত বছরে এ ধরণের একটি অত্যাধুনিক সূক্ষ্ম ও কুশলী কারিগর-নির্ভর শিল্প যে বেশি দূর অগ্রসর হতে পারবে না, তা সহজেই আন্দাজ করা যায়। ভারতে প্রস্তুত কমপিউটার বলে বর্তমানে যে যন্ত্রগুলি বাজারে কিনতে পাওয়া যাচ্ছে, তার কোনোটাই ভারতে তৈরি নয়। তাইওয়ান, সাউথ কোরিয়া, হংকং, সিঙ্গাপুর, জাপান ও আমেরিকার বাজার থেকে কমপিউটারের খোলা যন্ত্রাংশ কিনে এনে ভারতীয় কোম্পানীগুলি জোড়া লাগিয়ে এক এক নামে বিক্রী করছে। তবে চেষ্টা চলছে দ্রুত বিদেশী যন্ত্রাংশের বদলে ভারতে নির্মিত যন্ত্রাংশ ব্যবহারের। সফটওয়্যার নির্মাণের ক্ষেত্রে আমাদের দেশ ইতিমধ্যেই অনেক এগিয়ে গেছে। আমরা এখন যে শুধু নিজেদের সফটওয়্যার বানাচ্ছি তাই নয়। কোটি কোটি টাকায়

সফটওয়্যার বিদেশে রপ্তানীও করছি। এছাড়া কমপিউটারে ব্যবহারের জন্য ফ্লপি ডিস্কেটস, প্রিণ্টার্স রিবন, ম্যাগনেটিক টেপ, ডিস্ক কার্টিজ, প্রিণ্ট হুইল, কমপিউটার ফার্ণিচার, এসবও আমাদের দেশে এখন তৈরি হচ্ছে।

ভারতের বিভিন্ন শহরে ভারতে প্রস্তুত যে কমপিউটারগুলি কিনতে পাওয়া যায় তার নিরানব্বই শতাংশই পি সি বা পার্সোনাল কমপিউটার। মডেল ও কর্মদক্ষতার তারতম্য অনুযায়ী এগুলির প্রত্যেকটির দাম পড়ে প্রায় কুড়ি হাজার থেকে পঁচাত্তর হাজার পর্যন্ত। নীচে ভারতের কয়েকটি কমপিউটার প্রস্তুতকারক সংস্থা ও তাদের নির্মিত মডেলের নাম দেওয়া হল।

(১) ডি সি এম – অলিম্পিয়া ৩২ (মাইক্রো / সুপার মিনি)।

(২) সি এম এস কমপিউটারস প্রাইভেট লিমিটেড—সি এম এস পি সি / এক্সটি ও সি এম এস পি সি / এটি (পার্সোনাল কমপিউটার)।

(৩) উইপ্রো ইনফরমেশন টেকনোলজি লিমিটেড—উইপ্রো পি সি (পার্সোনাল কমপিউটার)।

(৪) আই ডি এম লিমিটেড—আই ডি এম পি সি-এক্সটি ও আই ডি এম পি সি-এটি (পার্সোনাল কমপিউটার)।

(৫) মিনিকম্প প্রাইভেট লিমিটেড—নেপচুন এক্সটি, নেপচুন এটি, নেপচুন পি সি (পার্সোনাল কমপিউটার)।

(৬) মহারাষ্ট্র ইলেকট্রনিকস কর্পোরেশন লিমিটেড—মেলট্রন ট্যানডন ৬০০০ পি সি (পার্সোনাল কমপিউটার)।
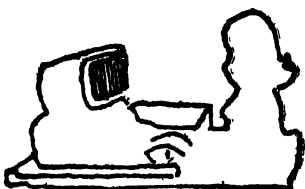
আরও কিছু তথ্য

ক্যাড (CAD) : কমপিউটার এইডেড ডিজাইন বা কমপিউটারের সাহায্যে প্রস্তুত নকশা।

ক্যাম (CAM) : কমপিউটার এইডেড ম্যানুফ্যাকচারিং বা কমপিউটারের সাহায্যে প্রস্তুত করা।

এফ এম এস (FMS) : ফ্লেক্সিবল ম্যানুফ্যাকচারিং সিস্টেমস বা পরিবর্তন-যোগ্য প্রস্তুত করার ব্যবস্থা।

পি সি (P C) : পার্সোনাল কমপিউটার বা নিজস্ব কমপিউটার।

সি এন সি (CNC) : কমপিউটার নিউমেরিক্যাল কন্ট্রোল বা কমপিউটার দিয়ে নিয়ন্ত্রণ।

ওয়ান (WAN) : ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক বা বিস্তৃত এলাকা জুড়ে কমপিউটার যোগাযোগ ব্যবস্থা।

ল্যান (LAN) : লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা অল্প এলাকা জুড়ে কম্পিউটার যোগাযোগ ব্যবস্থা।

নাম্বার ক্রানচার : যেসব কমপিউটার বহু সংখ্যক সংখ্যা নিয়ে কাজ করতে পারে তার আর এক নাম।

সিলিকন : এক ধরণের পদার্থ যা ভূস্তরে পাওয়া যায়।

ষ্টেট অব দি আর্ট : সর্বাধুনিক ব্যবহারযোগ্য প্রযুক্তি।

ফ্লপি ডিস্ক : ছোট কমপিউটারের তথ্য বা পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে রাখার অংশ যাকে ষ্টোরেজ ইউনিট বা মেমরি ইউনিট বলে। এই ডিস্ক নমনীয় প্লাষ্টিক দিয়ে তৈরি হয়। ওপরে চৌম্বক পদার্থের প্রলেপ থাকে।

লাইট পেন : কলমের মত দেখতে একটা বৈদ্যুতিক দণ্ড যা দিয়ে সরাসরি কমপিউটার স্ক্রীনে ছবি অাঁকা যায়।

হার্ডওয়ার : কমপিউটারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ যথা কি-বোর্ড, প্রিণ্টার, ভিডিও স্ক্রীন ইত্যাদিকে হার্ডওয়্যার বলে।

সফটওয়্যার : কমপিউটারে কাজ করার জন্য তৈরি প্রোগ্রামের নাম সফটওয়্যার।

হাই-টেক : শিল্পোৎপাদনে ব্যবহৃত সব ধরণের উন্নত প্রযুক্তি।

ডাম্ব টার্মিনাল : কোনও কমপিউটারের কি-বোর্ড ও ভিডিও স্ক্রীনের একত্রিত আলাদা নাম।

স্পিচ সিনথেসাইজার : এক ধরণের যান্ত্রিক ব্যবস্থা যা কমপিউটারের নির্দেশ পেলে কথা বলতে পারে।

পেরিফেরাল : কমপিউটারের যেসব যন্ত্রাংশ সরাসরি গণনার কাজে অংশ নেয় তাদের এক কথায় পেরিফেরাল বলে।

পাইরেট সফটওয়্যার : চুরি করে সফটওয়্যার নকল করার কাজকে এই নাম দেওয়া হয়েছে।

প্লটার : কমপিউটারের সঙ্গে লাগানো যান্ত্রিক ব্যবস্থা যা দিয়ে ছবি, নকশা প্রভৃতি ছাপা হয়।

ডেইজি হুইল : ফুলের মত দেখতে কমপিউটার প্রিণ্টারের একটি যন্ত্রাংশ।

ফিল্টার : বৈদ্যুতিক ভোল্টেজের ওঠানামার ধাকা সামলায় কমপিউটারের ভেতরের যে যন্ত্রাংশ।

কমপিউটারাইজড হোম : যে বাড়ীর অধিকাংশ কাজ কমপিউটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

ইলেকট্রনিক কটেজ : যে বাড়ীতে বসে, অফিসে বা কারখানায় না গিয়ে, কমপিউটারের সাহায্য নিয়ে, অফিস বা কারখানার কাজ করা যায়।

কলোসাল কেভ : এক ধরনের কমপিউটার গেম।

কমপিউটারিজ : কমপিউটার ব্যবহার নিয়ে কমপিউটার প্রযুক্তিবিদরা যেসব খিস্তিখেউর করে।

কমপিউটার ডেটিং : কমপিউটারের সাহায্য নিয়ে মনের মত বন্ধু বা বান্ধবী নির্বাচন।

কমপিউটার-হরোস্কোপ : কমপিউটার দিয়ে প্রস্তুত ঠিকুজি কুষ্ঠি।

গিগো (GIGO) : গারবেজ ইন, গারবেজ আউট অর্থাৎ ভুল তথ্য কমপিউটারে দিলে ফলাফলও ভুল হবে।

মিট কমপিউটার : মানুষের মস্তিষ্ক।